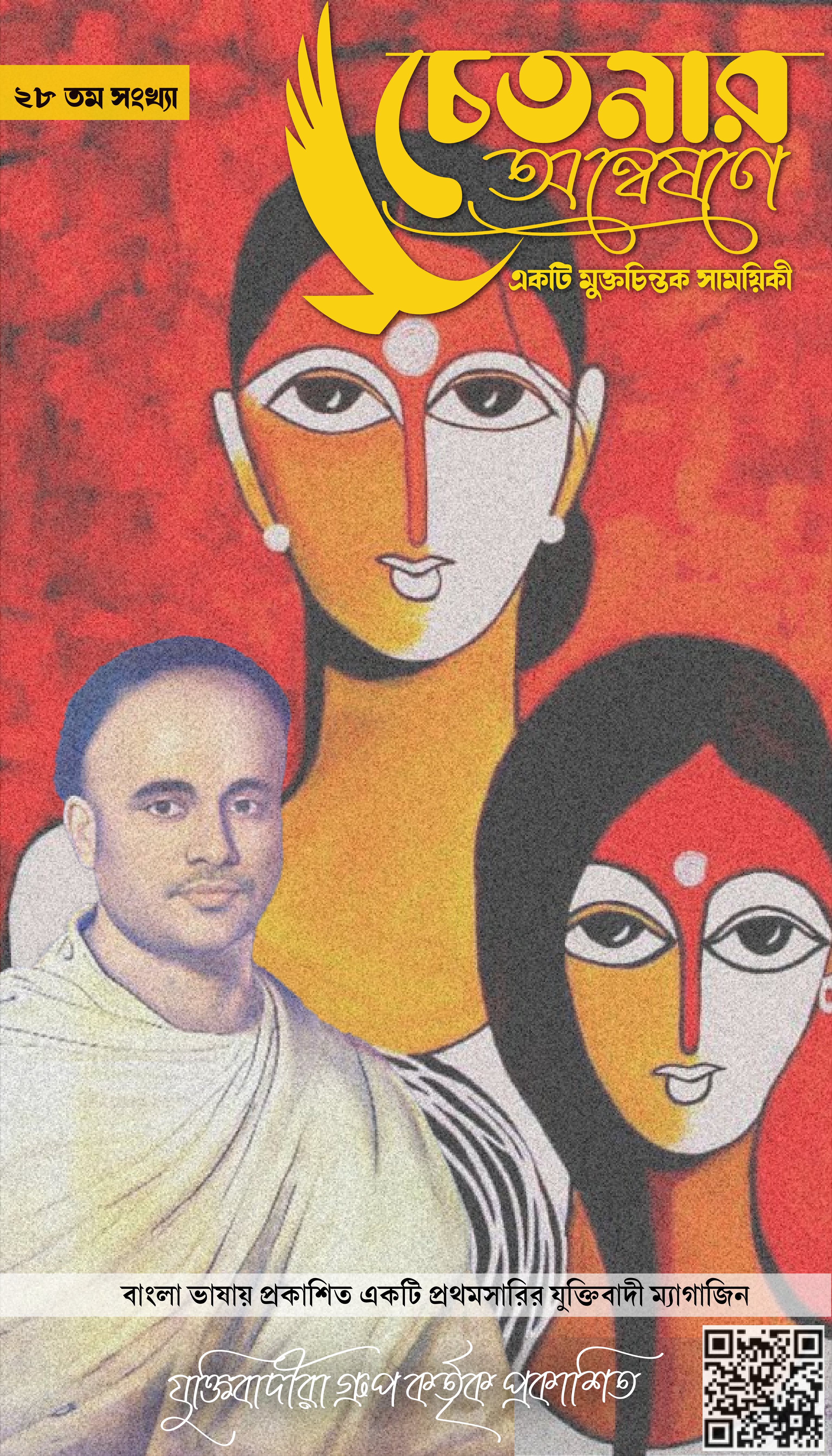
২৮ তম সংখ্যা

চেতনার অন্বেষণে

একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী



বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির যুক্তিবাদী ম্যাগাজিন

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আজ ২৬ সেপ্টেম্বর এক মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, তিনি বাঙালির অন্যতম মেরুদন্ড বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর জন্মদিনে সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই এবং এই দিনটিকে আমরা যুক্তিবাদীরা **শিক্ষক দিবস** হিসেবে পালন করছি।

আপনারা যারা নিয়মিত পত্রিকাটি পড়েন, জানেন যে পত্রিকাটি মূলত যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তক, বিজ্ঞানমনস্কদের লেখায় উৎসাহ প্রদান করার প্রয়াস থেকেই শুরু হয়েছে। ধর্মের ধ্বজাধারী ও জড়পন্থীদের বিরুদ্ধে এই লড়াই ভীষণই অসম। এই লড়াইতে আপনিও সাথী হোন। যেমন পারেন, যতটুকু পারেন কলম ধরুন, লিখুন। আপনার লেখা ও ভাবনা ছড়িয়ে পড়ুক।

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে 'চেতনার অন্বেষণে' পাঠকদের মাঝে সমাদৃত হয়েছে এবং বড়ই গর্বেরও কারণ যুক্তিবাদের ওপর অনলাইনে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথমসারির একটি ম্যাগাজিন হতে পেরেছে।

নতুন করে অডিও পডকাস্টের দিকে আমরা ঝুঁকছি, সেটাপ গঠন করা হয়েছে, দ্রুতই সেদিকেও ফোকাস করবো।

দুঃখের বিষয় মানুষ বই পড়া থেকে দূরে সরছে, মোবাইলে ফেসবুক, রিলসের যথেচ্ছাচারে অহেতুক সময় কাটাচ্ছি। পাঁচশ জনের অধিক মানুষ আমাদের সমীক্ষায় জানিয়েছেন ফেসবুক বই পড়ার আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। এরচেয়ে বড় শকিং নিউজ আর কী হয়ে পারে! এতে অ্যাটেনশন কমছে। চেষ্টা করুন ব্যাগে একটা বই রাখার, বাসে ট্রেনে যখন যাচ্ছেন মোবাইল না খুলে বইয়ের পাতা উল্টান। মোবাইল ব্যবহার করতে হলেই 'চেতনার অন্বেষণে'র

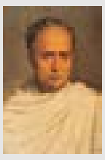
মতো ম্যাগাজিন পড়ুন। আমরা টেলিগ্রামে ম্যাগাজিন, বই, ভালো মুভি, পডকাস্ট যতোটা পারছি আপডেট করার চেষ্টা করছি। বুক ক্লাব মিটিং কয়েকমাস পরেই আর এগোতে পারিনি। আপনারা উদ্যোগ নিলে সেটি আবার শুরু করতে পারি। যেখানে মাসে একটি করে বই পড়তে দিই, বইটি পড়ার শেষে আলোচনায় বসি।

ম্যাগাজিন নানা কারনে কিছুদিন বিরতি নিতে হয়েছিল। আপনাদের পাশে থাকার জন্যই সর্বোপরি ম্যাগাজিনটি এতোটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছে, আরও বহুপথ যাওয়া বাকি। প্রচলিত পত্রিকা থেকে বেরিয়ে সময়ের সাথে আপডেট করেছি। মোবাইলে পড়ার উপযুক্ত করে নির্মাণ হয়েছে। এবারের সংখ্যাটিও আপনাদের মন জয় করবে এটুকু আশা করছি।

ম্যাগের শেষ পাতায় মতামত দেওয়ার একটি বাটন যুক্ত আছে। ওখানে কোনও লেখা বা সামগ্রিকভাবে কেমন লাগল, আলোচনা-সমালোচনা, মতামত জানাতে পারেন, এতে আমরা সমৃদ্ধ যেমন হবো তেমনি পাঠকের সাথে লেখক ও টিমের একটি সুহৃদ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

> "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"
>
> – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ - ২৯ জুলাই ১৮৯১)



চেতনার অন্বেষণে

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির যুক্তিবাদী ম্যাগাজিন

সম্পাদক

প্রসেনজিৎ

সহ সম্পাদক

সৌমেন, সজল, সৌভিক এবং রাজু

সম্পাদনা সহায়তা

উপেন, অভিষেক, সায়ন, শুভ্র, রাজর্ষি, সুদীপ প্রামাণিক, তুষার, সুপ্রতিম, মানস, রাতুল এবং অনুপম মিত্র

গ্রাফিক্স ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

প্রসেনজিৎ

যোগাযোগ

ইমেইল: yuktibadira@gmail.com
হোয়াটস্অ্যাপ: +91 9433-794-113

Website

Whatsapp
+91-9433 794 113

Telegram
@Yktibadira

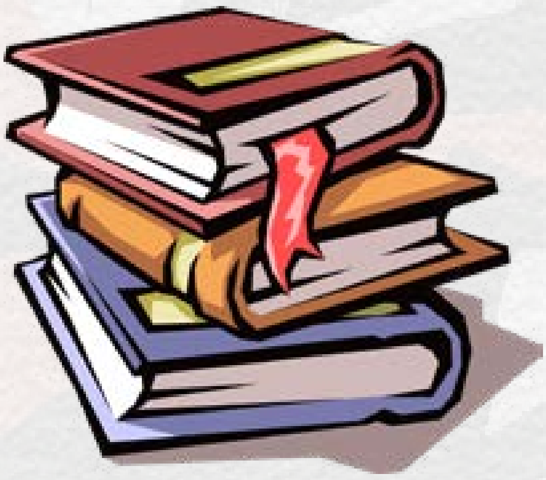
মতামত জানান

বিনিময় মূল্য নাই

কলকাতা - ৫৬ থেকে যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

এমাসে মুক্তচিন্তক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি যুক্তিবাদী **অশোক দাস চার্বাক** মহাশয়কে। প্রবীণ লেখক। তাঁর একটি নাটক 'ডাকাত দলের কুঁড়ি' প্রকাশিত হয়েছে এবারের পত্রিকাতে। লেখককে শুভেচ্ছা জানাই।



টেলিগ্রামে যুক্তিবাদীদের প্রয়োজনীয় বইপত্র চেতনার অন্বেষণে চ্যানেলে রয়েছে আপনারা এই সুবিধা গ্রহন করতে পারেন

অ্যাডোবি রিডার ও মুন রিডার অ্যাপে পত্রিকাটি পড়ুন এবং ক্লিকেবল বাটন দিয়ে নেভিগেট করুন সহজেই।

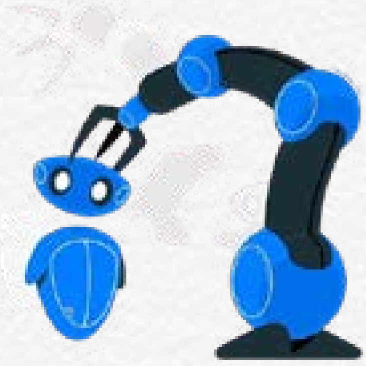
এই বাটনগুলি ক্লিক করে সহজেই কাঙ্খিত পাতায় যাওয়া যায়

লেখা পাঠান

সূচিপত্র




ECONOMY





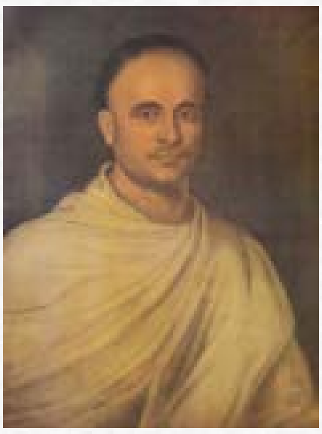

INDIA
200
125 YEARS OF VIDYASAGAR COLLEGE



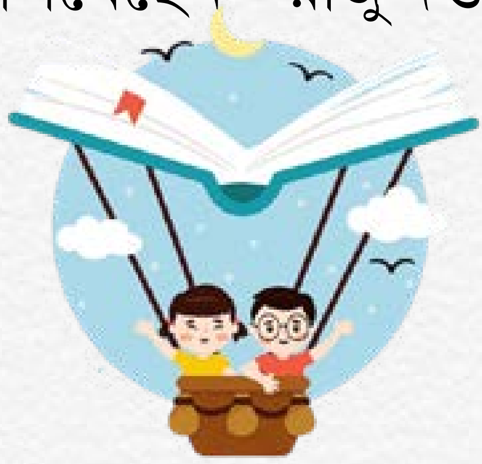












কবিতা সংকলন



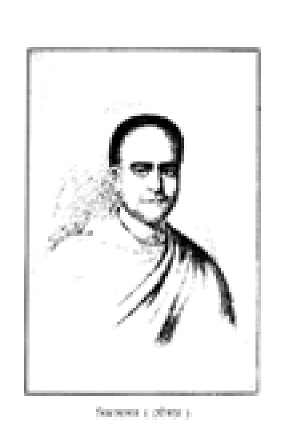
১৭৮ পাতায়

১৭৮ পাতায়

বিশেষ সংযোজন

বিদ্যাসাগর: চরিত্রের বিশিষ্টতা

লিখেছেন – শ্রীশরৎ কুমার রায়



২০৩ পাতায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

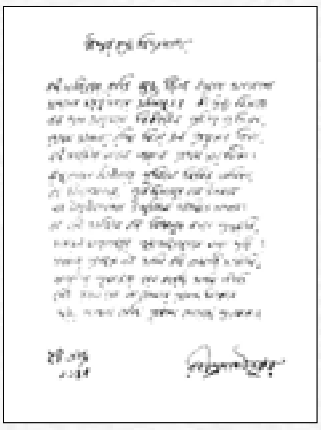
লিখেছেন – রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



২১২ পাতায়

বিদ্যাসাগর চরিত

লিখেছেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



২২১ পাতায়

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ সমাজসংস্কারে নারীমুক্তি

লিখেছেন - পার্থ সারথি চন্দ্র



"ধন্য তুমি বিদ্যাসাগর, ধন্য তোমার জ্ঞান
বঙ্গমাতার গর্ভে তুমি ধন্য সুসন্তান।
জ্ঞানের আলো দিয়ে তুমি করলে বিদ্যা দান,
ধন্য তুমি ভারতভূমির গর্বের সন্তান"।

প্রাতিষ্ঠানিক উপাধি কী ভাবে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে, তার উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য তিনি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর জায়গায় 'শর্ম্মা' বা 'শর্ম্মণঃ' লিখতেন। তাঁর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি শুধু তাঁর কৌলিক উপাধিই শুধু নয়, নামটিকে পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে

'বিদ্যাসাগর চরিত' নামেই যে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে বিলীন হয়ে পড়েন। অবশ্য সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে দয়া ও বিদ্যার পরিবর্তে 'অজেয় পৌরুষ' ও 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'কে প্রধান গৌরব বলে অভিহিত করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন পরবর্তী নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে প্রচলিত কুপ্রথা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতায়, আবার বিধবা নারীদের মুক্তির জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলনে অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন।

প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিদ্যাসাগর নামেই বেশি পরিচিত। উনবিংশ শতকের বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বললে হয়ত ভুল বলা হবে না।

তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেছিলেন। এবং তিনি যে শুধু বাংলা ভাষাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও সকলের বোধগম্য করে তুলেছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বাঙালি সমাজে প্রগতিশীল সংস্কারের একজন অগ্রদূত।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই তিনি লাভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর উপাধি। বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে যুক্তিবহ করে তোলেন ও সহজবোধ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা সংস্কারে তাকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করা হয়। এ ছাড়া দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত কখনই তার দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না।

১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বীরসিংহ সেই সময় হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সুপণ্ডিত ও বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা পুরুষ। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কম বেতনের চাকরি করতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামেই মা ভগবতী দেবী ও ঠাকুরমার সঙ্গে বাস করতেন। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হয়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাকে কলকাতার একটি পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দু-বছর ওই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া প্রতি বছরই তিনি বৃত্তি এবং গ্রন্থ ও আর্থিক পুরস্কার পান। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করার অল্প পরেই ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই কলেজের শিক্ষকদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। এর আগে এ কলেজে পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্রদের, কিন্তু তিনি সব শ্রেণীর হিন্দুদের জন্যে কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

কলেজে পড়ার জন্যে নামেমাত্র বেতন চালু করেন এবং প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রোববার সপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি নিয়ে যাতে ছাত্ররা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করতে পারে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনেন কলেজের পাঠ্যক্রমে। আগে ব্যাকরণ এবং বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং ইংরেজি বিভাগকে উন্নত করেন।

মধ্যযুগ থেকে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলস্বরূপ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত ছিল বহুবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ- এর মত কুপ্রথাগুলি। পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার্থে অধিক বয়স্ক পাত্রের সাথে এমনকি অনেকসময় মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সাথে অল্পবয়সী (বালিকা বয়সে বা শিশু বয়সে) মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে। যার ফলশ্রুতি অকাল বৈধব্য। এই অল্পবয়সী বিধবাদেরকে সহমরণে যেতে অথবা ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করা হত।

অনেক বিধবা পরিবারের লোকজনের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হত। অকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেক মেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিত আবার কেউ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হত।

সকলের পক্ষে যৌন কামনা বাসনা দমন করে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব ছিল না। যার অনিবার্য ফল ছিল ভ্রূণহত্যা। এতটাই নারকীয় ছিল বিধবাদের জীবন।

মুসলিম সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল

না। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদের পর কার্যকারণ (সমাজে বিধবাদের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে যায়) সূত্রেই হিন্দুসমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচলন করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

যদিও বিদ্যাসাগরের পূর্বেই (প্রায় একদশক আগে থেকেই) ঊনবিংশ শতাব্দীর চারের দশক থেকে রামমোহনের অনুগামীরা, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ছাড়াও 'তত্ত্ববোধিনী', 'জ্ঞানান্বেষণ' ইত্যাদি একাধিক পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি বিধবা বিবাহের সমর্থনে মুখর হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তাঁদের এই আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিল। যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার বিস্তার ছাড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজ থেকে দীর্ঘদিনের এই সামাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সর্বাগ্রে পদক্ষেপ নেন।

১৮৫৪ সালের ফাল্গুন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিবিষয়ক প্রস্তাব' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারীতে তিনি বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম বই প্রকাশ করলে তা সমাজের সর্বস্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ছাড়া এদেশীয় মানুষজন বিধবা বিবাহকে কোনোমতেই স্বীকৃতি দেবে না, তা বিদ্যাসাগর ভালোমতই জানতেন। তাই তিনি বিধবা বিবাহ বিষয়ক বইতে পরাশর সংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করেন :

> "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"

অর্থাৎ স্বামী নিখোঁজ হলে বা মৃত্যু হলে, নপুংসক বা পতিত হলে তাঁর স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ বিধিসম্মত। তিনি শাস্ত্রের লাইন তুলে ধরে এটাও উল্লেখ করেন মনুস্মৃতি অনুযায়ী বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও, মনু নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, আর পরাশর নিরূপিত ধর্ম কলিযুগের

ধর্ম। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই তিনি বিধব-বিবাহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এতো সহজে বিধবাদের বিবাহের সপক্ষে যুক্তিকে মেনে নেয়নি। তারাও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিধবা বিবাহের বিপক্ষে, কখনো আবার বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে লেখালেখি হয়। তাদের অযৌক্তিক চিৎকার, অর্থহীন কটূক্তিতে বিব্রত হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে লেখেন,

“যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরমধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।”

শুধুমাত্র বই প্রচার আর বিবাদ বিতর্কের মধ্যে দিয়েই যে বহু প্রাচীন লোকচার, কুসংস্কার ভেঙে দেওয়া যাবে না, তা বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। তাই তিনি আইনের মাধ্যমে বিধবা বিবাহকে বৈধ করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর ৯৮৭ জন গণ্যমান্য, প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ একটি আবেদন পত্র জমা দেন তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে। প্রতিবাদীরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

ধর্মসভার রাধকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় ৩৩,০০০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে পিটিশন জমা পড়ে সরকারের দপ্তরে।

এত বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের যুক্তি মান্যতা পায় এবং অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বড়লাট লর্ড ডালহৌসি 'The Hindu Widows’ Remarriage Act' প্রণয়ন করে বিধবা বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেন।

বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে সমাজে এতটাই তোলপাড় হয়েছিল যে, কখনও বিদ্যাসাগরের পক্ষ নিয়ে, আবার কখনও তাঁকে বিদ্রূপ করে একাধিক সাহিত্য,

রচনা, চিঠি সেই সময়কার পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের তাঁতিরা "বিদ্যাসাগর পেড়ে" নামে একধরণের শাড়িও বার করেছিলেন, সেই শাড়ির পাড়ে বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গেয়ে, বিধবা বিবাহের সপক্ষে একটি গান লেখা ছিল। বিধবাবিবাহ কেন্দ্রিক আন্দোলন শুধু কলকাতার শিক্ষিত মানুষের আন্দোলন হয়ে থাকেনি, তার প্রতিক্রিয়া জেগেছিল বাংলার গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র।

১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক সহায়তায় প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়; শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাথে বিধবা কন্যা কালীমতির বিবাহ। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করেই ক্ষান্ত হননি, বিধবাদের বিবাহ দিতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন, বিধবাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য তহবিল তৈরি করেন। বিধবা বিবাহ সম্পাদনকালে দেখা গেল, কিছু অসৎ ব্যক্তি নিছক অর্থের লোভে বিধবা বিবাহ করত এবং কিছুদিন পর তাকে পরিত্যাগ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠত। এইসব অসাধু ব্যক্তির প্রবঞ্চনা নজরে এলে, বিদ্যাসাগর এব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী হয়ে ওঠেন এবং বিধবা বিবাহের নামে এই বজ্জাতি দূর করতে পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকার পত্রে সই করিয়ে নেওয়ার রীতি চালু করেছিলেন। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ১১ বছরে প্রায় ৬০টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং এই সমস্ত বিবাহের সাথে তিনি কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই বিয়ের চার দিন পর ১৫ই আগস্ট বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের চিঠির প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন, "আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি

লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পরিতাম না। ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।...কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। স্ত্রীজাতির দুর্দশার অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি বাংলায় কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার দিকেই আঙ্গুল তুলেছিলেন। তিনি নিজেও এই কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তাই এই প্রথার কুফল সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে সরকারের কাছে পিটিশন দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আইন প্রয়োগ করে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আরেকটি আবেদন পত্র জমা দেন। আবেদন পত্রে উল্লেখ্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজা মেহতাবচাঁদ। কুলীনেরা অধিকাংশই কেবলমাত্র অর্থলালসা চরিতার্থ করার জন্য একাধিক বিবাহ করত। বিবাহের ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও তারা পালন করত না। এই নামমাত্র বিবাহে মেয়েদের ভাগ্যে শুধুই বঞ্চনা জুটত। অপরপ্রান্তে কামনার আবেগে বা শিক্ষার অভাবে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটত। বহুবিবাহ প্রথার এই সকল কুফল সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা এবং এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার অভিপ্রায়ে

বিদ্যাসাগর আবেদন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আবেদন পাঠানোর দুই বছরের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ভারত সরকার আর বহুবিবাহের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর রানী ভিক্টোরিয়া শাসনভার গ্রহণ করলে বহুবিবাহের বিপক্ষে আবার আবেদন পাঠানো শুরু হয়। বহুবিবাহের সমর্থনেও রাধকান্ত দেবের মতো অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালের ৫ই এপ্রিল বাংলার ছোটলাট বিডন সাহেব উদ্যোগী হয়ে ভারত সরকারকে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেও সরকার এব্যাপারে অগ্রসর হতে সাহস করেনি, কারণ বিধবা বিবাহে আইন প্রণয়নে কেবলমাত্র অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মাত্র, কোনো জোরজবরদস্তি ছিল না, কিন্তু বহু বিবাহ আইন করে নিষেধ করতে গেলে তাতে জবরদস্তি করা হয়। আসলে অনেকেরই ধারণা ছিল বিধবা বিবাহের আইন প্রবর্তনই সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। তাই এইরকম আইন বিষয়ে ইংরেজ সরকারের ভীতি জন্মেছিল। বাংলার সরকারের উদ্যোগে অবশেষে বহুবিবাহ নিবারণের প্রসঙ্গে একটি কমিটি তৈরি হয়। তবে এই কমিটির মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগরই আইন প্রয়োগ করে বহুবিবাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এরপরেও বিদ্যাসাগর নিচেষ্ট ছিলেন না।

১৮৭১ সালে বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম বই 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রকাশিত হয়। এই বইতে বাংলাদেশের বহু বিবাহকারী ব্যক্তিদের উপর একটি সমীক্ষা তুলে ধরেন।

তাতে দেখান এমন অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ রয়েছেন যাদের স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। ১৮৭২ সালে তিনি এই বিষয়ে দ্বিতীয় বই প্রকাশ করেন। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেইসময় বহু

বিবাহের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কেননা হিন্দু সমাজের বহুবিবাহের বিপক্ষে প্রশ্ন তুললে, অনেকে মুসলিম সমাজের বহুবিবাহের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ইংরেজ সরকার তাই এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার কোনো ঝুঁকিই নিতে সাহস পায়নি।

বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রথম সংস্কারমূলক রচনা 'বাল্যবিবাহের দোষ' ১৮৫০ সালে 'সর্ব শুভকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি স্বয়ং ১৪ বছর বয়সে অষ্টমবর্ষীয় দিনময়ী দেবী বিবাহ করেছিলেন, তাই এই প্রথার কুফলগুলি অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যথোপযুক্ত যুক্তি দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রগতিশীল হিন্দুসমাজ বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়ে আন্দোলন শুরু করে।

অথচ সরকারি প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের মতো একজন দেশীয় পণ্ডিতকে যতটা দরকার, তার চেয়ে বেশি ‘অনুগ্রহ’ দেখায়নি ইংরেজ। বিদ্যাসাগরেরও সে সবের প্রয়োজন হয়নি। ১৮৫৭-র ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র ১৫ মে-র মধ্যে বিদ্যাসাগর মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ইংরেজ সরকার এই ‘প্রিয়’ পণ্ডিতের কাছেই জানতে চাইল, কেন বিদ্যাসাগর প্রত্যাশা করছেন স্কুলগুলির জন্য সরকারি সাহায্য মিলবে এবং কেনই বা কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়া এই কাজ করা হয়েছে? নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শেষমেশ সরকারি কাজেও ইস্তফা দিলেন তিনি।

শুধু তা-ই নয়, ১৮৮০-র পয়লা জানুয়ারি সরকার বিদ্যাসাগরকে সিআইই উপাধি দেওয়ার কথা জানায়। কিন্তু কেতাদুরস্ত পোশাক পরে রাজদরবারে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণের লোক এই মানুষটি নন। তাই তিনি চলে গেলেন কার্মাটাঁড়ে। কিছু দিন পরে লাটসাহেবের দফতরের এক কর্মচারী ও এক চাপরাশি পদক নিয়ে হাজির হলেন পণ্ডিতমশায়ের কাছে।

বিদ্যাসাগর তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু দু'জনেই দাঁড়িয়ে। বকশিস চান। বিদ্যাসাগর বললেন, 'এই পদক বেনের দোকানে বেচে দাও। যা পাবে, দু'জনে ভাগ করে নিও।' শুধু তা-ই নয়, পরে লাট সাহেবের প্রাইভেট এন্ট্রির তালিকা থেকে নিজের নামটি সযত্ন কাটিয়েও দিলেন এই 'প্রিয়পাত্র' !

আসলে দান বা দানধর্মী অনুগ্রহ স্বীকারে বিদ্যাসাগরের চিরকালের অনীহা। তা সে ইংরেজ সরকার বা বর্ধমানের মহারাজা-যাঁরই দেওয়া হোক। কারণ হিসেবে, বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে এক রা, 'আমি কারো দান নিই না। কলেজের বেতনেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে।' কিন্তু এই আচরণের জন্য 'অহঙ্কারে একেবারে চক্ষুঃ কর্ণ উভয়েন্দ্রিয় হারাইয়াছেন' বিদ্যাসাগর, এমন তোপ দেগে বসল 'সম্বাদ ভাস্কর'।

অথচ প্রকৃত অহংয়ের জন্যই এই মানুষটি গৃহস্থালীর টুকিটাকি জেনে পরিচারককে বলতে পারেন, 'তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার গুরু।'

জনজীবনে এ সব অপমানের তবুও কোথাও বাঁধ ছিল। কিন্তু বাঙালি সেই অপমানেরও বাঁধ ভাঙল বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময়ে। কিছু দিন হল বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বইটি প্রকাশিত হয়েছে (জানুয়ারি, ১৮৫৫)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বাংলার পথে-ঘাটে-সমাজে তীব্র আলোচনা শুরু হল। পক্ষে মত কম না হলেও বিপক্ষে মত ধারে-ভারে অনেকটাই এগিয়ে।

বিদ্যাসাগরের এই বই ও ভাবনার প্রতি শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব প্রথমে সহানুভূতিশীল থাকলেও পরে বিরুদ্ধবাদীদেরও 'তুষ্ট' করলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সোজাসুজিই লিখলেন, 'বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।/ বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।।' 'সংবাদ প্রভাকর'-এ একটি চিঠিতে পত্রলেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রীতিমতো নানা অশালীন ইঙ্গিত করলেন। তবে দাশরথি রায়

আর শান্তিপুরের তাঁতিরা দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগরের পক্ষে। ‘বিদ্যাসাগর পেড়ে’ শাড়ি বুনলেন তাঁতিরা। পাড়ে লেখা থাকল বিদ্যাসাগরের জয়গান, ‘সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ’য়ে।’ যদিও এর পাল্টা বাঙালি শুনল, ‘শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।’

এমনই নানা বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে শেষমেশ বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল। কিন্তু প্রবল বিরুদ্ধবাদীরা ভাবলেন, আইনে কী বা হয়। কিন্তু সেই ধারণাও গুঁড়িয়ে গেল ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। আইনসম্মত বিধবা বিবাহ হল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কালীমতী দেবীর।

বিদ্যাসাগরের জয় হলেও এই বিয়ের সূত্রেই তাঁর বৌদ্ধিক ধারণায় নেমে এল আঘাত। এ বার রমাপ্রসাদ রায়ের কাছ থেকে। তিনি এ বিয়েতে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন আগে তিনি জানালেন, এ বিয়েতে তাঁর মনে মনে মত রয়েছে। সাধ্য মতো সাহায্যও করবেন। কিন্তু বিবাহস্থলে না-ই বা গেলেন! ঈশ্বর সব বুঝলেন। আর দেওয়ালে টাঙানো মনীষীর ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।’ ছবিটি রাজা রামমোহন রায়ের। রমাপ্রসাদ তাঁরই পুত্র।

রমাপ্রসাদ যে আঘাত দিলেন, পথে নেমে কুৎসিত ভাবে তা-ই যেন প্রকট করল সে কালের বাঙালি জনতার বড় অংশ।

বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার ‘অপরাধে’ সমাজে একঘরে করা হল বিদ্যাসাগরকে। পথে বেরোলেই জোটে গালমন্দ, ঠাট্টা, অশালীন ইঙ্গিত। কেউ বা মারধর, খুনের হুমকিও দেয়। ব্যাপারটা শুধু হুমকিতে থামল না। বিদ্যাসাগর শুনলেন, তাঁকে খুন করার জন্য ভাড়াটে গুন্ডাদের বরাত দিয়েছেন কলকাতার এক নামী ব্যক্তি।

বিদ্যাসাগর নিজেই সেই তথাকথিত নামীর ঘরে গেলেন। বললেন, 'শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনাদের ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।' এই সময়পর্বে ছেলেকে রক্ষার জন্য ঠাকুরদাস বীরসিংহ থেকে জেলে-সর্দার তথা লেঠেল শ্রীমন্তকে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠান। ঠনঠনের কাছে এক হামলার উপক্রম থেকে বিদ্যাসাগরকে রক্ষাও করলেন শ্রীমন্ত সর্দার।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রয়াস কতটা সফল হয়েছিল তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠে এসেছে। শহরে উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই বিধবাবিবাহ প্রথা। অনেকেই তাঁকে ব্যর্থ বলে সমালোচনা করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকতার বিচারে কোনো প্রচেষ্টার সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। হিন্দু সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর এই আন্দোলন নারী আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে (১৮৫৬) সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাফল্য তাঁকে যে বিপুল জনপ্রিয়তা প্রদান করে, তাতে তাঁর বিদ্যাসাগরীয় পরিচয় আরও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য সর্ব ভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন। উনিশ শতকে তাঁকে নিয়ে গান বাঁধা হয়েছিল। শান্তিপুরের তাঁতিদের কাপড়ে বিদ্যাসাগর নাম উঠে এসেছে। একপলক দেখার জন্য উদ্গ্রীব জনতা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অথচ তাঁকে দেখে নিরাশ হয়েছে। দৃষ্টিনন্দনযোগ্য চেহারা তাঁর ছিল না।

আসলে মূর্তিকে প্রতিমা গড়ে তোলাতে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বিমুখ। এ জন্য রেলি ব্রাদার্সের একখানি কাপড়কে ফেঁড়ে একখণ্ড পরতেন আর একখণ্ড গায়ে দিতেন। পায়ে থাকত দেশি মুচির শুঁড়তোলা চটিজুতো। শুধু তাই নয়, তাঁর সামনের চুল অবাঙালিসুলভ ছাঁটা।

রামমোহন রায় ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা রদ করে যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তার পরিসমাপ্তির দায়ভার নিজের কাঁধেই নিয়েছিলেন। সতীদাহ রোধে জীবন বাঁচলেও মনে আর মানে বাঁচা দায় হয়ে উঠেছিল বিধবাদের। সে ক্ষেত্রে, ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে সেই বিধবাদের চোখের জল মোচনেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বহুবিবাহ রোধ থেকে বাল্যবিবাহের প্রতিরোধেও শামিল হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নারীশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের লক্ষ্যেই ছিল দেশের মানুষের সার্বিক প্রগতি। স্বেচ্ছায় পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ আত্মীয়পরিজনহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যেও আজীবন জনবিচ্ছিন্ন হননি। মানসিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিক্ততাবোধে তাঁর জীবনের সেরা কাজ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য একবার সখেদে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তা থেকে সরে থাকেননি। স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের সুহৃদ ছিলেন। বারবার প্রতারিত হওয়ার পরে সেই পরম সুহৃদকে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।’

জীবিত অবস্থায় বিদ্যাসাগর অনেকের শ্রদ্ধা পেলেও তুলনায় কাছের লোক, পরিচিতদের থেকে পাওয়া আঘাত, অপমানই বড় হয়ে বেজেছে তাঁর বুকে। সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নীরবও নন। তাই কখনও কখনও অনুযোগ করেছেন। লিখছেন,

‘আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দ্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।’

কিন্তু অভিমান, রাগ, দুঃখের মতো মানবপ্রবৃত্তির কারণেও ‘ডিউটি’ ভোলেননি তিনি। আর তাই গ্রাম ছাড়লেও তাঁরই হাতে তৈরি গ্রামের স্কুলকে ১০০ টাকা, চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০ টাকা এবং ‘ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক’দের জন্য ৩০ টাকা উইলে বরাদ্দ করেছেন।

তবে সব ভুলেই হয়তো এই গ্রামে ফিরতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু ‘ফিরব বললে ফেরা যায় না কি’! গ্রামে ফেরার অপূর্ণ ইচ্ছে নিয়েই ১৮৯১-এর ২৯ জুলাই চিরঘুমে চলে যান বাঙালির প্রিয় ঈশ্বর।

নশ্বর দেহটি শেষ হল। গর্বের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর বাঙালির জন্য রেখে গেলেন তাঁর অভিমানও। তাই কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলে উঠলেন, ‘বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে - বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন... তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।’

সেই তীর্থস্থান রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালির। আর তা হলেই নীলকণ্ঠ বিদ্যাসাগরের বুকে জমে থাকা অপমানের বোঝা খানিক লাঘব হবে।

বলা বাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র সেই নিঃসঙ্গ জীবনের অন্তিম পর্যায়ে কলকাতা ছেড়ে সুদূর কার্মাটাড়ে গিয়েও তাঁর স্বধর্মে সক্রিয় থেকেছেন। তাঁর প্রত্যাশাহীন দানধ্যান নিয়ে উপকার করলে অপকার পাওয়ার কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সেই ‘অসার ও অপদার্থ’ লোকজনের প্রতি তার পরেও অবিচল ভাবে সক্রিয় থেকেছে তাঁর সাহায্যের হাত। অন্য দিকে, ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন সাগরের জলের মতোই বিরূপ সমালোচনাও স্বাভাবিক, কিন্ত সেটাই সব নয়। তা

পানের অযোগ্য হলেও তাই আবার বাষ্পায়িত হয়ে পানীয় জলের উৎস হয়ে ওঠে, দাহিত হয়ে লবণ নিষ্কাশন করে। তিনি যে যথার্থই বিদ্যাসাগর। সে দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিতের অবিকল্প প্রতিভূ, তা তাঁর বিদ্যাসাগরেই প্রতীয়মান।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে এলেন নারী। আলো জেগে উঠল বাংলার চরাচরে। স্বাধীনতা মানে নারী শিক্ষা। পুরনো সংস্কারের পুঁথি থেকে অক্ষরের বর্ণমালার সুরে বেজে উঠল নারী জীবন।

তিনি একবার বলেছিলেন,

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে; ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে; আর দেশের মানুষ চোখ বুজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে – এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই; আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে; স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারে বারে ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়"।

বাঙ্গালিকে অক্ষর পরিচয় করিয়েছেন, আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দেশবাসীকে মানুষ করবার। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য একটা গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন! নারীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আজ এতোটা জোর পেয়েছে, সেই প্রতিবাদ প্রথম যাঁদের কন্ঠে গর্জে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

আজ সেই বেঁটেখাটো বাঙালি মানুষটির জন্মদিন। তাঁর নাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বেঁচে থাকলে এই বছর ২০৩ বছরে পা দিতেন বিদ্যাসাগর। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যে ক্রম আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, তা ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন এই মানুষটিই। আধুনিক বাংলায় কোনও একটা লেখা লিখতে গেলে দাঁড়ি, কমাসহ অন্যান্য যতিচিহ্ন কেমন ভাবে

দেওয়া উচিত, তাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এক জীবনে যা-যা কাণ্ড তিনি করে গিয়েছেন, সবটা তো আর এখানে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু জেনো, এই একটি মানুষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ লাফ মেরে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা পথ। বাংলা মায়ের সুযোগ্য এই সন্তানের প্রয়াণ দিবসে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:– ‘করুণাসাগর বিদ্যাসাগর’ : ইন্দ্রমিত্র, ‘বিদ্যাসাগর’: চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভ্রমনিরাশ’, ‘বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত’ : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ‘বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ’: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাসাগরচরিত’: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোরক পত্রিকা', আনন্দবাজার পত্রিকা, বিবিসি ডট কম, প্যারালাল, এম ডট প্রিয় ডট কম।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“ভারতীয় সনাতনী পণ্ডিতেরা এমন একদল লোক যাঁদের দীর্ঘদিনের কুসংস্কার কিছুতেই দুর করা যাবে না। তারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের শাস্ত্র অভ্রান্ত না হয়ে পারে না... এইসব লোকের আনুকূল্যে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেন না তাদের কোনও রকম সাহায্য আমরা চাই না। এঁদের বিরুদ্ধতাকে আমাদের ভয় করার কোনও কারণ নেই, কেন না এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যেতে আরম্ভ করেছে।”

–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

ইউনিফর্ম সিভিল কোড ও সরকারি সদিচ্ছা

লিখেছেন - বিশ্বনাথ মুরমু



সরকারের যদি সেই সদিচ্ছাই থাকে যে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, জাতি, ধর্ম, ধনী, গরীব, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যেন সমান ন্যায়বিচার পায়, তবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) কেন? ভারতবর্ষের নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান কে কি একটা মাত্র সাধারন (common) আইন দিয়ে বাঁধা যাবে বা বাঁধা সম্ভব? কখনই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, একজাতি-ধর্মে এক আইন হলে সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষের অনেক ভিন্ন-ভিন্ন জাতি, ধর্ম-ভাষার মানুষদের নিজস্ব নিজস্ব সামাজিক সংবিধান আছে(হতে পারে তা অলিখিত) এবং সেই অনুযায়ী (প্রচলিত রীতি) তাদের জীবনধারা অতিবাহিত হয়, এবং এতদিন ধরে হয়েও চলেছে। সেখানে এই মূহুর্তে এটাই দেখার যে, পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে, তা খাপ খাইয়ে নিতে পারে কিনা অর্থাৎ যুগোপযোগী কি না, এবং সেই সংবিধানে মানবিক ন্যায়ের আবেদন আছে কি না। সেই সেই সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেই, যদি সেখানে, কোন এক বা একাধিক রীতিতে অমানবিক ও অন্যায় কিছু দেখা যায়, তবে সেগুলিকে মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত করে,

অনুশাসনগুলিকে লিপিবদ্ধ করে, তাদের জন্য নিজস্ব নিজস্ব সংবিধানের লিখিত রুপ দেওয়া যেতে পারে। হতে পারে তা সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, কিন্তু অসম্ভব নয়। প্রতিটি রাজ্যে প্রবীন আইনজ্ঞ নিয়ে গঠিত এক একটি কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধকরনের কাজ চলবে। তারপর ল' কমিশন সেইগুলি নিয়ে গ্রন্থনার কাজ করবে। হয়ত, আগামী পাঁচ বছরের কম সময়েই তা করা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ কিনা, এভাবে বিভিন্ন জাতিসত্বার যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডগুলি জন্ম নেবে, তার সমাহারকে একত্রে মাল্টিপল সিভিল কোড (MCC - Multiple Civil Code) বলা যেতে পারে। নচেৎ, দেশ জুড়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যা সরকার চালু করতে চাইছে, তার বিরোধিতা হতেই থাকবে, হতেই থাকবে। এবং নেহাৎ সরকার একতরফাভাবে, বলপ্রয়োগ না করে একে কোন হাউসেই পাস করাতে পারবে না, বা দেশজুড়ে কোনদিনই লাগু করতে পারবে না।

আমাল্টিপল সিভিল কোডে এক ছাতার নীচে, জাতি-ধর্ম হিসাবে এভাবে অনুশাসন বা আইনগুলিকে আনা যেতে পারে: ১- হিন্দু সিভিল কোড, ২- মুসলিম সিভিল কোড, ৩- শিখ সিভিল কোড, ৪- কৃশ্চিয়ান সিভিল কোড, ৫- পারসিয়ান সিভিল কোড, ৬- জৈন সিভিল কোড, ৭- বুদ্ধিস্ট সিভিল কোড, ৮- ট্রাইব্যাল সিভিল কোড, (ক) নর্থ ইস্টার্ন ট্রাইব্যাল সিভিল কোড। (খ) আদার স্টেটস ট্রাইব্যাল সিভিল কোড ইত্যাদি। যে যে জাতি-ধর্ম গোষ্ঠীর জন্য আদালত স্বীকৃত সিভিল কোড ইতিমধ্যেই বিদ্যমান, সেই সেই জাতিগোষ্ঠীর জন্য নতুন করে কোন সিভিল কোড আনার প্রয়োজন নেই (পরিমার্জন করা যেতে পারে)।

ভারতে হিন্দুর পরেই জাতিগোষ্ঠী হিসাবে মুসলিমদের নাম উঠে আসে। মুসলিমদের মধ্যে নানারকম বিভাজন আছে। তাদের মধ্যে নানাবিধ যা যা সামাজিক আইন

আছে(পারসোনাল ল’ অথবা শরীয়তি আইন), সেগুলোর মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত অনুশাসন লিপিবদ্ধ করে, যথা – ১) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে। ২) এক পত্নী জীবিত থাকাকালীন অন্য পত্নীগ্রহণ নিষিদ্ধ করে অথবা ৩) ন্যায় সংগতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পরেই অন্য পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে, ৪) যে কোন ওভাবে তিন তালাক বলে ডিভোর্স নিষিদ্ধ করে, ৫) খোরপোসের দাবী বিধিবদ্ধ করে, ৬) তরুন তরুনীর বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ করে, ৭) নারী–পুরুষের বিয়ের (নিকা) বয়সের অসামঞ্জস্যতা নিষিদ্ধ করে, ইত্যাদি, আদালতগ্রাহ্য মুসলিম সিভিল কোড তৈরি করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, যে দেশে এই মূহুর্তে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনা জরুরী, অন্যদের জন্য নয়। সেটা করা অসম্ভব অথবা প্রায় অসম্ভব জেনেই কি সরকার সারা দেশের, সব মানুষের উপর ইউনিফর্ম সিভিল কোড চাপাতে চায়?

আদিবাসীদের আশঙ্কা যে ইউ সি সি চালু হলে তারা তাদের নিজের রীতি(custom) মত জীবন যাপন করতে পারবে না, এবং তারা এতদিন সংবিধান প্রদত্ত যে সুযোগ ও সুবিধাগুলো ভোগ করত, সেগুলির অবলুপ্তি ঘটবে। সেই আশঙ্কা থেকেই তারা ইউ সি সি র বিরোধ করছে এবং তা প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে।

আদিবাসীদের মধ্যে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, একই ক্রিয়াকর্মের (পূজো, বিয়ে, বিয়ের বিচ্ছেদ, শ্রাদ্ধ, নামকরন, অশৌচ কাটানো, সৎকার, দত্তক, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি) যে যে পার্থক্য দেখা যায়, এই প্রক্রিয়ায় তা ইউনিফর্ম (Uniform) রুপ নেবে, যার ফলে আদিবাসীদের মধ্যেও বাদানুবাদ অন্তর্হিত হবে। এই সব ক্ষেত্রে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়ও, অনুশাসন হিসাবে সেসব লিপিবদ্ধ হওয়ায়, এখন যে কোন আদালতের পক্ষেও তাতে রায় দিতে কোনই অসুবিধা হবে না। এতদিন, আদিবাসী সংক্রান্ত সিভিল কোন

মামলার রায় কোন আদালতের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বা আদিবাসী সংক্রান্ত কোন মামলায়, আদিবাসী মাঝি/মোড়ল/পারগানার সাহায্য অতি আবশ্যিক ছিল।

কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে, প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য যা যা ইউনিফর্ম সিভিল কোড তৈরি হবে, তা সবই মাল্টিপল সিভিল কোড – এরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু, এ পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে যা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে, বেশির ভাগই মুসলিম পারসোনাল ল' সংক্রান্ত। এক মুসলিম মহিলা অ্যাডভোকেটও, একটি ভিডিওর মাধ্যমে সবার কাছে আবেদন রেখেছেন যেন মুসলিম মহিলাদের সুবিচার পেতে, সবাই যেন ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে সমর্থন করেন। তাই যদি মূল কারণ হয়, তাহলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে কেন? কেন নয় শুধুমাত্র মুসলিম ইউনিফর্ম সিভিল কোড?

তাই যুক্তিযুক্ত হবে এটাই যে, যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড সরকার চালু করবে বা চালু করতে চলেছে, তা যেন শুধু হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই চালু হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি – ধর্ম সম্প্রদায় এবং কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর নয়। তাহলেই সব দিক রক্ষা করে এখনই ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করা সম্ভব হতে পারে।

এই দেশের দুর্ভাগ্য এটাই যে, এখানে সব কিছুকেই রাজনৈতিক ফায়দার বা ভোট ফ্যাক্টরের অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। ফলে, মঙ্গলজনক কাজের সরকারী সদিচ্ছাও ব্যর্থ হয়।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

প্রতিটি জ্যোতিষীই ভন্ড

লিখেছেন - গৌতম মন্ডল



যে যত বড় জ্যোতিষী সে তত বড় ভন্ড বা প্রতারক। এদের মতে আকাশের বিভিন্ন গ্রহ আমাদের উপরে অনেক প্রভাব ফেলে। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা আছি সেই পৃথিবীর কোন প্রভাব আমাদের উপরে নেই। রাতের আকাশে গ্রহগুলোকে দেখে চিহ্নিত করার মুরোদ এদের কারোরই নেই। কিন্তু গ্রহগুলোর গতিপথ এরা বদলে দিতে পারে! দূরের সেই গ্রহদের গতিপ্রকৃতি বদলে ভাগ্য পাল্টাতে এরা বিভিন্ন পাথর দেয়। এখন দেখে নেওয়া যাক এই পাথরগুলো আসলে কী?

১. নীলা:

নীলা কী? নীলা হল কপার সালফেটের কেলাস। $CuSO_4, 5H_2O$ হল এটার রাসায়নিক নাম। তামা আর সালফার ছাড়া এর মধ্যে অন্য কোনো ধাতু বা মেটাল নেই। বাকি যা আছে


নীলা স্টোন

তা হল পাঁচ অণু জল। এবারে এটা কীভাবে গ্রহের গতিপথ বদলে দেবে সেটা নাসার গবেষকেরা কেউ-ই বলতে পারবেন না। বলতে পারবে শুধুমাত্র ভণ্ড জ্যোতিষীরাই।

২. প্রবাল কী?

প্রবাল হল অ্যান্থজোয়া শ্রেনীভূক্ত সামুদ্রিক প্রাণী। এদের নিকটাত্মীয় হল সাগর কুসুম। এরা সাগর কুসুমের মতই পলিপ তৈরি করে, তবে সাধারণত এরা কলোনি তৈরি করে বসবাস করে। এরা প্রাণী হলেও, জীবনের পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় সাগরতলে কোন দৃঢ় তলের উপর গেড়ে বসে বাকি জীবন পার করে দেয় নিশ্চল হয়ে। প্রতিটি প্রবাল পলিপ যেখানে গেড়ে বসে সেখানে নিজের দেহের চারপাশে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) নিঃসরণের মাধ্যমে শক্ত পাথুরে খোলস বা বহিঃকঙ্কাল তৈরি করে। একটা প্রবাল পলিপের মৃত্যুর পরেও খোলসটি রয়ে যায় এবং তা অস্মীভূত হয়ে যেতে পারে। এরকম অস্মীভূত প্রবালের দেহাবশেষের উপর নতুন করে আবার প্রবাল বসতে পারে। এভাবে একটা কলোনি বহু প্রজন্ম ধরে চলার ফলে বড়সড় পাথুরে আকৃতি ধারণ করে। এভাবেই তৈরি হয় বড় প্রবাল দ্বীপ এবং প্রবাল প্রাচীর। অস্ট্রেলিয়ার সন্নিকটে গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবালপ্রাচীর। রাসায়নিক ভাবে ক্যালসিয়াম কার্বনেটই হল প্রবাল।এবারে এই প্রবালের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ কীভাবে গ্রহের গতিপথ বদলে দিতে পারে সেটা নাসার গবেষকেরা কেউ-ই বলতে পারবেন না।বলতে পারবে শুধুমাত্র ভণ্ড জ্যোতিষীরাই।



৩. মুক্তো কী?



ঝিনুকের মধ্যে তৈরি মুক্ত আসলে 86% calcium carbonate ($CaCO_3$) 2 - 4 % জল ~ 10 % conchiolin (an organic binding agent)। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুক্তও প্রবালের মতোই রাসায়নিক ভাবে ক্যালসিয়াম কার্বনেটই। শামুক,ঝিনুকের খোলের প্রধান উপাদান এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট।ক্যালসিয়াম কার্বনেট কীভাবে আকাশের গ্রহের গতিপথ বদলাবে? সবচেয়ে বড় কথা প্রবাল বা মুক্ত যে আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এতটা জানেই না জ্যোতিষীরা। তারা শুধু জানে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে পকেট কাটতে।



৪. চুনি (Ruby) কী?

খনিজ বা বৈজ্ঞানিক নাম কোরান্ডাম। Al_2O_3 লাল বা নীল রঙের। কীভাবে ভাগ্য পাল্টাবে এই এলুমিনিয়ামের যৌগ? আর যদি পারেই বদলাতে তাহলে আপনার আমার বাড়ির এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়াই,প্রেশারকুকার দিয়েই তো ভাগ্য বদলে ফেলা সম্ভব।



৫. পান্না কী?

বেরিল (বেরিলিয়াম এলুমিনিয়াম সিলিকেট)$3Be.Al_2O_{3,}6SiO_3$ সবুজ রঙের স্বচ্ছ পদার্থ। এটাও সেই এলুমিনিয়ামের যৌগ।সঙ্গে আছে সিলিকন। যেটা বালিতে থাকে। তাহলে পান্না না নিয়ে এলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে কিছু বালি নিলেই তো পান্নার কাজ হওয়া উচিত।

৬. গোমেদ কী?

গোমেদ হল গারনেট। রাসায়নিক ভাবে এটা হল

$3MgO/CaO/MnO.Fe2O_3/Cr_2O_3/Al_2O3\ 3SiO_3$ অর্থাৎ এলুমিনিয়াম ছাড়া ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ক্যালশিয়াম ও লোহা আছে এতে। এটার রঙ লাল, বাদামি, কমলা হয়। এইসব মেটালগুলোর গ্রহের গতিপথ বদলানোর ক্ষমতা কীভাবে হল সেটা কোনো রসায়নবিদ বলতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। জ্যোতিষীরা জন্মেও শোনেনি বা শেখেনি গোমেদের রাসায়নিক পরিচয়, তারা এটার সাহায্যে ভাগ্য বদলে দিতে না পারলেও লোকজনের পকেট ফাঁকা করে দিতে পারে।



গোমেদ স্টোন

৭.পোখরাজ কী?

পোখরাজ হল টোপাজ।

Al_2SiO_4. স্বচ্ছ। এটাও সেই এলুমিনিয়ামের যৌগ। সঙ্গে আছে সিলিকন। যেটা বালিতে থাকে।



পোখরাজ

৮. ক্যাটস আই কী?

কোয়ার্টজ। SiO_2 সিলিকন ডাই অক্সাইড। এককথায় এটা বালিই। বালির রাসায়নিক রূপভেদ মাত্র। এর বদলে পকেটে কিছু বালি নিয়ে চলুন। একই রেজাল্ট পাওয়া উচিত।



ক্যাটস আই

৯. হিরে কী?

কার্বন বা C, হিরে কার্বনের রূপভেদ মাত্র। তাই দামি হিরের বদলে এক টুকরো কয়লা সঙ্গে রাখলেও একই ফল পাওয়া উচিত।

আমজনতা এত জেনে বুঝে গেলে রত্ন বা পাথর কীভাবে বিক্রি হবে? জ্যোতিষীদের ব্যবসা বা কুসংস্কার কীভাবে টিকে থাকবে? আর কলকাতার বা দেশের নামজাদা গ্রহরত্নের দোকানগুলোই বা রমরম করে চলবে কিভাবে? কয়েক বছর আগে, নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে টিভিতে, কাগজে বহুল বিজ্ঞাপন দেওয়া এক জ্যোতিষী ঘুমোতে ঘুমোতে নিজের খাটেই সিগারেটের আগুন থেকে পুড়ে মারা গেলেন। কোন পাথরই কাজ করেনি। আসলে জ্যোতিষী ব্যাপারটা মোটের ওপর বেঁচেই আছে আমার আপনার মনের দুর্বলতাকে পাথেয় করে।

সুতরাং কুসংস্কার জিন্দাবাদ, ভগবান জিন্দাবাদ, ভাগ্য জিন্দাবাদ, জ্যোতিষ জিন্দাবাদ।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

ইসরোর চেয়ারম্যানের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি

লিখেছেন - অশোক মুখোপাধ্যায়



মাননীয় শ্রীধর পানিক্কর সোমনাথ সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার প্রতিষ্ঠান আজ (২ সেপ্টেম্বর ২০২৩) সফল ভাবে সূর্যের উদ্দেশ্যে একটি মহাকাশযান আদিত্য-এল১ উৎক্ষেপন করেছে। আশা করি এর যাত্রা শুভ, সফল এবং উদ্দেশ্যমণ্ডিত হবে। সফল চন্দ্র অভিযানের পরে পরেই যেভাবে ৪০০ কোটি টাকা খরচ করে এই উৎক্ষেপন হল, আমাদের কু-মনে কিছু কুচক্কুরে প্রশ্ন জেগেছে। সেগুলো একে একে রাখছি।

প্রশ্নগুলো এই রকম:

১) আপনারা জানিয়েছেন, সূর্য সম্পর্কে নানা রকম নতুন তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই নাকি এই অভিযান।

মুশকিল হল, এই মাস দুয়েক আগে উজ্জয়িনীর মহর্ষি পাণিনি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আপনি প্রধান অতিথির ভাষণে জানিয়েছিলেন, ঋগবেদ থেকে শুরু করে সূর্যসিদ্ধান্তেই নাকি আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত খবর সঞ্চিত ছিল। পশ্চিমের লোকেরা আরবদের মাধ্যমে সেগুলো ভারত থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওদের বিজ্ঞানটা বানিয়েছে। এখন সেগুলোই ওদের আবিষ্কার হিসাবে চলছে। তাহলে চাঁদে সফল অভিযানের পরে কী এমন ঘটল, আপনার নিজের বলা সেই কথাগুলি ভুলে গিয়ে আপনারই প্রতিষ্ঠান আবার একটা সূর্য অভিযান সংগঠিত করতে গেল?

বৈদিক ঋষিরা কি তবে সব কিছু বলে যেতে পারেননি? অনেক কিছু বাকি থেকে গেছে? পরে এমন হবে না তো, আপনারা এখন যা কিছু জানবেন, ভবিষ্যতে অন্য এক প্রজন্ম এসে (আপনারই মার্গ অনুসরণ করে) বলবে, সবই বেদে পুরাণে ছিল, সেইগুলিই সোমনাথরা টুকে নিয়ে এখন নিজেদের অভিযান প্রাপ্ত তথ্য হিসাবে চালাচ্ছে?

আপনারা যা কিছু জানবেন, আর সেগুলি বৈদিক ঋষিদের মতো খোলা অবস্থায় ফেলে রাখবেন না। আমার পরামর্শ হল, সব কিছু পেটেন্ট নিয়ে রাখবেন। আপনি নিশ্চয়ই (নিজেকে দিয়েই) জানেন, "সবই ব্যাদে আছে" লবি আমাদের দেশে ভারি শক্তিশালী!

২) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে ১৫,০৯,৪০,০০০ কিলোমিটার। কথায় লিখিলে — পনেরো কোটি নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার কিমি। আপনারা যে মহাকাশযান পাঠালেন সে যাবে পনেরো লক্ষ কিমি দূর পর্যন্ত; অর্থাৎ, সূর্যের দূরত্বের এক শতাংশ। সেখানে থেকেই সে সূর্যকে আবর্তন করে ঘুরবে এবং আপনাদের তথ্য পাঠাবে। আপনারা কী করে আশা করছেন, এইটুকু মাত্র দূরত্ব পাড়ি দিয়েই ৯৯ শতাংশ দূর থেকে আপনারা সূর্য সম্পর্কে এমন কিছু নতুন তথ্য জানতে পারবেন, যা এর আগে জানা যায়নি? ৪০০ কোটি

টাকা স্রেফ জলে থুরি আদিত্যের তেজে ভাসিয়ে দেওয়া হল না?

আর কাছে যে যাওয়া সম্ভব নয়, সূর্য যে চাঁদের মতো নিরীহ "গ্রহ" নয়, সে যে সদাই "কুপিত" হয়ে থাকে, সে সব আমরা জানি বলেই আরও দূরে কেন যাচ্ছেন না, সেই প্রশ্ন তুলছি না। পৃথিবীতে ক্ষুধার সূচকে ১০৭ নম্বর দেশ হিসাবে (এবং আশা করা যায়, এক দেশ এক ভোটের গাওনা সফল হলে এই তালিকায় আমাদের অবস্থান আরও নিম্নগামী হতে পারবে), এই টাকায় অনেকগুলি তথাকথিত জনমুখী প্রকল্প সফল হতে পারত, যা সরকার টাকার অভাবের কথা বলে বরাদ্দ করতে পারছে না। এই টাকা যদি আপনারা রোজগারও করে থাকেন, এটা আপনারা সরকারকে দিয়ে বলতে পারতেন, "যাও, কটা ক্ষুধিত মুখে অন্ন তুলে দাও।"

৩) আপনি পূজাপাঠে বিশ্বাস করেন, দেশের আদিশাস্ত্রেও আপনার নাকি অগাধ ভক্তি। তা এখন এই মহাকাশযান পাঠালেন, এ কি সূর্যকে বৈদিক ঋষিদের কথা মতো "গ্রহ" বলে ধরে নিয়ে রওনা দিল? নাকি পশ্চিমা বিজ্ঞানী দের বয়ান মাফিক তাকে নক্ষত্র বলে মেনে নিল?

৪) উপরের প্রশ্নটা নেহাত ছেলেমানুষি ঠাট্টা তামাসার জন্য করছি না। মহাকাশযানের যাত্রাপথটি পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ভ্রমণশীল হলে যেরকম হবে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আবর্তমান হলে তার থেকে অন্য রকম হবে। আপনাদের প্রদত্ত বিবৃতি ও ছবিটবি দেখে যদ্দুর মনে হচ্ছে, আপনারা বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রটন্ত্র অবজ্ঞা করে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করেই মহাকাশযান উৎক্ষেপন করেছেন। কী সব নিউটন অয়লার লাগ্রাঞ্জ প্রমুখ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের কথায় নাচানাচি করছেন। এবার কি তাহলে আপনি পাণিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলে এসেছিলেন, সেগুলি ফেরত নেবেন? নাকি, ভাষণ দেবার সময় সেই সব গুলতাপ্পিই চালিয়ে যাবেন, আর রকেট নিয়ে কাজ করার সময় পশ্চিমি

বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে চলবেন?

৫) আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞান এবং গণিত এক আধটু বোঝেন, তাঁদের জন্য জানিয়ে রাখি, শুধু সূর্য আর পৃথিবীকে ধরলে কে কার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে, মহাশূন্যের জ্যামিতি বা পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে খুব বেশি ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু যেই আপনি একটি তৃতীয় পক্ষকে ঢোকাবেন (এখানে আপনাদের প্রেরিত মহাকাশযান), ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তখন ভূকেন্দ্রিক মডেলে মহাকাশযানের যাত্রাপথ যেমন হবে, সূর্যকেন্দ্রিক মডেলে সেরকম হবে না। সেই জন্যই এই জানতে চাওয়া।

৬) ভালো থাকবেন। ২০২৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে একটা মঙ্গল যাত্রা ঘটানো যায় কিনা ভেবে দেখবেন। সূর্যের তুলনায় দূরত্ব অনেক কম। শিবশক্তি মহাকাশ স্টেশনে নেমে দুদিন বিশ্রাম নিয়েও পাঠানো যেতে পারে। এতে এক দেশ এক ইসরো এক ভোট গাওনায় দারুণ সুবিধা হবে! আমরা আশায় মুখিয়ে থাকব।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা সহ –

নিবেদক আকাশ ভক্তবৃন্দ

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

“বিশ্বাস ও অন্ধভক্তি দিয়ে আর যাই হোক, বিজ্ঞানচর্চা বাঁচিয়ে রাখা যায় না” –আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

অমোঘ লীলা, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীজাত প্রসঙ্গে যুক্তিবাদী নিরীক্ষণ

লিখেছেন - অভিষেক ঘোষ



অমোঘ লীলা ইসকনের এক গৈরিকধারী, ভক্তিমান বাঙালির তথাকথিত গদগদ আবেগে ভয়ানক আঘাত করে খবরে উঠে এসেছে। ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে বাঙালিরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের এ'হেন অপমানে নাওয়া খাওয়া ভুলে নেমে পড়েছে মাঠে। এবিষয়ে অমোঘ লীলার বক্তব্য সবাই শুনেছেন। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, ওঁর মতে বিবেকানন্দ মাংস খেয়ে ভয়ানক ভুল করেছেন, একমাত্র পিওর ব্রান্ডের ভক্ত হচ্ছে তারাই যারা মাংস ও নিষিদ্ধ ভোজন ভক্ষণ করে না। রামকৃষ্ণর 'যত মত তত পথ'কে ব্যঙ্গ্যাত্মক উচ্চারণ করে মজা করে বলেছেন - 'যত মত তত পথ' হতেই পারে না একমাত্র পথ হল কৃষ্ণর পথ। ইস্কন বা রামকৃষ্ণ মঠের ভক্ত সমেত আপামর বাঙালি চর্চা করে কম আবেগে ভাসে বেশি। যদি চর্চা করত, জানার

চেষ্টা করত তাহলে জানতে পারত অমোঘ তার গুরু অভয়চরণের ধারণার অনুসরণ মাত্র করেছে। অভয়চরণের মতামত অনুসারে বাঙালিরা বিবেকানন্দের দ্বারা নষ্ট হয়েছে, এবং রামকৃষ্ণ সম্পর্কেও তার উচ্চ মতামত ছিল না। এই লেখার শেষে অভয়চরণের বক্তব্যের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। এটা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে প্রতিটা ধর্মমত আসলে একটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মতোই। সেই প্রতিষ্ঠানকে যত মানুষ (পড়ুন ভক্ত) সাবস্ক্রাইব করে, গ্রহন করে, টাকা ঢালে, ততই তাদের লাভজনক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মমত ও প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মসূচিই হচ্ছে অন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে ছোট করে দেখানো। কেউ এটা পরিকল্পিতভাবে করে থাকে, কেউ করে থাকে লুকিয়ে। এই গোপণতা নানা কারণেই প্রয়োজন। অন্যতম কারণ, সরাসরি অন্যের বিরোধ করলে, কিছু prospective ভক্ত আবার আঘাত পেয়ে কেটে না পড়ে।

আসলে সব ধর্ম মতই চোরাগোপ্তায় গোঁড়া। ইস্কন তো বটেই, রামকৃষ্ণ মিশনও। মুখে 'যত মত তত পথ' বললেও স্বয়ং সারদাদেবী বলেছেন রামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ও অদ্বৈতবাদী এমনকি কোন এক অদ্বৈত আশ্রমের মিশন কেন্দ্রে রামকৃষ্ণর ছবি রাখাও তিনি পছন্দ করেননি। বস্তুত অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত বেদান্ত 'হিন্দু' ধর্মগুরু শঙ্কর প্রচারিত একটি মত। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু। 'যত মত তত পথ' বলে তারা কিন্তু মুসলিম মতে আজান দেয় না বা বাইবেল মতে প্রেয়ার করে না। তারা শুদ্ধ সংস্কৃতে আরতি গায়।

যাই হোক, অমোঘলীলা বেচারা এই গোপনতা বজায় রাখতে পারেনি। তার গুরুপ্রদত্ত শিক্ষাই উগরেছে সে। চোর চোরের বাড়িতে চুরি না করার স্বাভাবিক নিয়ম সে লঙ্ঘন করেছে।

ইস্কন তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠিয়েছে প্রায়শ্চিত্ত করাতে। আচ্ছা ইস্কন কি জানত না তাদের মহাগুরু অভয়চরণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে কি বলেছে? অবশ্যই জানত।

তাদের মতামত অতি স্পষ্ট, কৃষ্ণ ছাড়া ভগবান নেই। রামকৃষ্ণপন্থীরা রামকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানে, মানে বিবেকানন্দকেও। এতে তাদের স্বাভাবিক আপত্তি থাকতে বাধ্য। তাহলে কেন অমোঘ লীলাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান? একমাত্র কারণ, জনমানসে নিজেদের সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা দেওয়া। লক্ষ বাঙালির রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবেগে আঘাত লাগলে তার যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা ইস্কন-এর পক্ষে যাবে না, একথা বলাই বাহুল্য। তার এই মেপে নেওয়া পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে বাঙালি কবি শ্রীজাত একটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন এবং বিবিধ শব্দসহযোগে বাঙালি আবেগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন অবোধ অমোঘ লীলা জানেই না, যে বাড়ির উঁচু তলা থেকে সে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বিরোধীতা করছে সেই বাড়ির ভিতটাই আসলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। আহা! ধন্য আবেগ! উনি সুন্দর অপযুক্তি দিয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হবার ক্ষমতা কারো নেই। এই অপযুক্তি পাড়ার দাদা, বা প্রো-চাড্ডিকূল থেকে এলে অবাক হতাম না কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির এক বাহকের কাছ থেকে এ জাতীয় হাস্যকর মন্তব্য আশাতীত। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমালোচনা করতে গেলে আগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হতে হবে! নাহলে কিছু বলতে পারার অধিকার নেই। শ্রীজাতের আলোচনা করতে গেলে আগে বাপু শ্রীজাতের মত কবিতা লিখে দেখাও! তারপরে এসো। ধন্য আবেগ!

এই আবেগ যুক্তি ও তথ্য থেকে অনেক দূরের। প্রতিটা মানুষ যে একজন ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ইউনিক, তার মতামত,

চিন্তা নিয়েই তা বোধহয় কবিটি আবেগের বশে বিস্মৃত হয়েছেন। তবে শ্রীজাতের দোষ নেই। তিনি জাতে কবি। তদুপরি বাঙালি। আবেগ নিয়েই উনি চলবেন। যুক্তিবাদী হবার দায় ওঁর নেই। এই দায় আমাদের। যুক্তিবাদীদের। আমরা নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি, সমস্ত ধর্মমতের সমস্ত ঈশ্বর ও অবতারকল্পনা মিথ্যা। তা সে আল্লা হোক, গড হোক, কৃষ্ণ হোক, বা নব্য অবতার রামকৃষ্ণ হোক। তাই দুই মতের দুই কাল্পনিক ঈশ্বরের এই লড়াই আমাদের কাছে যেমন হাস্যকর তেমন চিন্তার বিষয়ও। আমরা জানি কোন ধর্মের প্রতি গোঁড়া বিশ্বাস ভক্তদের নিয়ে যায় জেহাদ, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের দিকে। নিজেদের কাল্পনিক ঈশ্বর তাদের কখনো রক্ষা করে না, তবে তারা প্রাণ দেয়, লড়াই করে এই কাল্পনিক ঈশ্বরের জন্যই। আমরা যেমন মনে করি কাল্পনিক ঈশ্বর কৃষ্ণের উপাসনা করার, তারজন্য জীবনপাত করাতে, প্রার্থনাতে যেমন কোন ফল নেই, ঠিক তেমনই আমরা জানি কাল্পনিক ঈশ্বরের (কৃষ্ণ-রাম-আল্লা-গড) জন্যই নিজের মানসিক শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রামকৃষ্ণ দুজনেই বাংলার উন্নত যুক্তিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী মতটিকে সার্থকভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দিকে। কবি শ্রীজাতের মত মানুষই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষিত হয়েও তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারেননি। অন্যদিকে অভয়চরণের বক্তব্যগুলিও নানান নিকৃষ্ট চিন্তায় ভরপুর। মনুবাদের প্রচারক, নারী ও শুদ্র বিরোধী। এই তিন ব্যক্তি গদাধর চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অভয়চরণ দে তিনজনেই আসলে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও সমাজকে পেছনে টানার শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং শ্রীজাতের মত মানুষ হচ্ছেন এই যুক্তি ও চিন্তার আলোকবহির্ভূত পশ্চাৎপন্থী সমাজের সার্থক প্রতিভূ।

অভয়চরণের বক্তব্য: https://youtu.be/728DDnFHYeo
https://youtu.be/eE2navu4zMA

নিবন্ধ

এক ঝলকে বিশ্বদর্শন

লিখেছেন - উল্লাসকর বন্দ্যোপাধ্যায়



আধুনিক বিজ্ঞান মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। বিগত শতাব্দীগুলোর সমস্ত বাঁধা পেরিয়ে বিজ্ঞান এখন স্বতন্ত্র স্বাধীন চেহারা নিয়ে উপস্থিত। তা সত্ত্বেও আজকের বিজ্ঞানের বিকাশের সামনেও বেশ কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। মহাবিশ্বকে বোঝা এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এরকমই একটা কঠিনতর চ্যালেঞ্জ। সেইসব অচেনা অজানা পাহাড় পেরিয়ে বিজ্ঞান তার গতি বাড়িয়ে যদি সত্যি সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে থাকে তবে তা হবে একুশ শতকের সবচেয়ে শ্লাঘার বিষয়। এই বিষয়টির একটু পরিচয় ঘটানোর জন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্ব প্রকৃতির কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চাইছি। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র পয়েন্ট করে দেওয়া হলো।

১) বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই বিশ্ব চেতনা নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন অস্তিত্বে বর্তমান।অর্থাৎ এইবিশ্বে কোথাও কখনো চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয় না বা চুণী রাঙা হয়ে ওঠে না। আমাদের চিন্তা চেতনার উপরে এর অস্তিত্ব নির্ভর করে না।তাই বিশ্ব প্রকৃতির বস্তুগত নিয়মগুলোও আমাদের

চেতনা, বুদ্ধি ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ।

২) বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে বিশ্বের প্রতিটি বিন্দু মানুষের জ্ঞান পরিসরে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে অর্থাৎ এই বিশ্ব অজ্ঞেয় নয়।সবটাই জ্ঞেয়। অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করলে জানতে পারব।

৩) এই বিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। কোনো অতিপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রক নেই। নিজস্ব নিয়মেই এর জন্ম।

৪) বিজ্ঞান এটাও দেখিয়েছে যে বিশ্বপ্রকৃতি শূন্য(Vaccum) থেকে সৃষ্টি। তবে এই শূন্যতা হলো কোয়ান্টাম শূন্যতা। প্রচলিত অর্থে আমরা যে শূন্যস্থানের কথা ভাবি এটা সেই শূন্যস্থান নয়।

৫) বিশ্ব কেন্দ্রহীন।এর যে কোনো বিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বের ৩৬০ ডিগ্রি সলিড অ্যাঙ্গেলে অদ্ভুত সিমেট্রি দেখা যায়।জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের সাহায্যে সুদূর বিশ্বের যে সব ছবি এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে এই কেন্দ্রহীনতাই প্রকাশিত।

৫) সমগ্র বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বিপরীতে বিশেষ বিশেষ অংশে শৃঙ্খলা অনেক বেশিমাত্রায় সংঘটিত হয়েছে।যেমন পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব। নক্ষত্রের জন্ম,ব্ল্যআক হোল সৃষ্টি তাপগতিবিদ্যার সূত্রানুসারে এইসব ঘটনায় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।কারণ বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকেই এই ঘটনা ক্রমাগত ঘটেছে বলেই তারা, নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ,ব্ল্যাকহোল তৈরি হয়েছে। সামগ্রীকভাবে এন্ট্রপি বেড়ে চলেছে। আবার বিভিন্ন অংশে এন্ট্রপি কমে সরল থেকে জটিলতর শৃঙ্খলার বস্তু তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে জটিল শৃঙ্খলার বস্তু মানব মস্তিষ্ক।

৬) বিশ্বের মোট ভরের অধিকাংশ dark matter হিসেবে সমগ্র বিশ্বের সব অংশে ছড়িয়ে আছে বলে বিজ্ঞান মনে করে।ফলে দৃশ্যমান জগতটাই বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র অস্তিত্ব

নয়।যদিও এই অস্তিত্ব অনন্ত অসীম।

৭) এই বিশ্ব- ব্রহ্মান্ড অতি দ্রুত হারে প্রসারিত হয়ে চলেছে।এই প্রসারণের গতি বিশাল এবং ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

৮) সর্ববৃহৎ বিশ্বের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন মৌল কণা (fundamental particles)।যার মধ্যে সাম্প্রতিক কালের হিগস্ বোসন ও আছে।

৯) বিশ্বপ্রকৃতির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টেলিপোর্টেশন(teleportation) এর মাধ্যমে প্রায় সময় খরচ না করেই তথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রযুক্তি তৈরির প্রস্তুতি চলছে।অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্ব এই বিশ্বে কার্যকর রূপে দেখা যাচ্ছে।

১০) এখনো পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে বোঝার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত প্রকৃতির নিয়মের ভাষা বলে প্রতিভাত হয়েছে।এই পর্যবেক্ষণ থেকে মনে করা হচ্ছে এটি গাণিতিক বিশ্ব(Mathematical Universe)।তাই বিশ্বকে জানতে, বুঝতে মানুষের সুবিধা হচ্ছে।

১১) মহাবিশ্বকে বুঝতে বিজ্ঞানীরা যে জ্যামিতির তত্ত্ব ব্যবহার করেন তা হলো অইউক্লিডিয় জ্যামিতি।এই তত্ত্বানুসারে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে হয় ছোট না হয় বড়।দুই সমকোণের সমান নয়। কারণ বিশ্বের দেশ(space) এই জ্যামিতির নিয়ম মেনেই চলে।

এই বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে নিয়ে এলেও এই প্রত্যেকটা বিষয় অতি বিশাল ও জটিল। তবে খুবই আকর্ষণীয়।তাই একঝলকে বিশ্বদর্শন ভালো লাগতেও পারে।

দেশবন্ধুনগর, কলকাতা -৭০০০৫৯

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'

লিখেছেন - জাহিদ রুদ্র



১ম

'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে, 'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।'
রত্নসিংহাসন- 'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ-শূন্য তাহা?'
'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'

ধর্ম বহু শতাব্দী ধরে প্রগতিশীল সমাজ তথা বিজ্ঞানের পথে হিমালয় স্বরূপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের পুরোহিতরাই খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালের শেষ দিকে সক্রেটিসকে বিষ পান করতে বাধ্য করেছিল। ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৬০০, বিখ্যাত দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী জিওর্নাদো ব্রুনোকে রোমে ধর্মীয় পুরোহিতরা জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। গ্যালিলিও এবং কোপার্নিকাসকে পাদ্রীরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। আচ্ছা আমরা কি জানি, কেন? তারা বলেছিল পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু বাইবেল বলেছিল যে

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা যুগে যুগে ধর্মের অন্ধ সমর্থকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। কারণ, একমাত্র বিজ্ঞানই পারে ধর্মের পুরোহিতদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে উন্মোচন করে তাদের হাজার বছরের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করতে।

কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তার জাতি, ধর্ম ও ভাষার বৈচিত্র্য অন্যান্য দেশের চেয়ে নিজস্ব স্বকীয়তায় আলাদা করেছে। দেশভাগের সময় ভারত বেছে নিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতা। এই আদর্শে শরিক হয়ে দেশের সংবিধান গড়ে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। আমাদের স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে কোনও দিন যুক্ত করা হয়নি। যদিও প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। আচ্ছা, আসলে কি ধর্মের আফিম খেয়ে শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, আদানি আম্বানির হাতে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তুলে দেওয়া, গঙ্গা দূষণ, সোনার মেয়েদের হেনস্থা, জল সঙ্কট, সব ভুলে গেছি!

আসলে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। খুবই অনাড়ম্বর ভাবে কোন রাখঢাকের অবর্তমানে সূচনা হয় ঐতিহাসিক নতুন সংসদ ভবন। মুঘল থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক এক সঞ্চারের পথে এগিয়ে চলছে নতুন ভারত। তার একটি বৃত্তীয় দিশা পাওয়া গেল বিকশিত ভারতের সাক্ষ্য হিসেবে। উত্তরভারতের আখড়ার লালচে গেরুয়া বাহিনির হাড়হিম উপস্থিতিতে, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হয়। আসলে কি বলা যায় সেই ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকরের পুস্তিকাঃ 'হিন্দুত্ব' / 'হু ইজ আ হিন্দু।' 'হিন্দু' কে? এর উত্তর আমরা পাই — সিন্ধু থেকে সাগর অবধি বিস্তৃত ভারতবর্ষকে যে একযোগে 'পিতৃভূমি' জ্ঞান করে সে-ই 'হিন্দু'। 'মুসলমানরা যেহেতু আরবকে তাদের 'পুণ্যভূমি' জ্ঞান করে, 'ওদের'

এবং অন্য বিধর্মীদের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। 'দেশদ্রোহী'দের তালিকায় পরে আরও কিছু নাম যুক্ত হয়, কম্যুনিস্ট, স্বাধীনচেতা নারী, সমকামী ইত্যাদি। এই পুস্তিকা প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই জন্ম হয় সঙ্ঘের। তাঁদের ইস্তেহারেরও। মেয়েদের জন্য তাঁদের পরিষ্কার বার্তাঃ একমাত্র রাষ্ট্রের বিপদেই শক্তিস্বরূপিনী-বেশে মেয়েরা ঘরের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে, নচেৎ তাঁদের থাকতে হবে ঘরের নিভৃতে, নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে। পুরুষের সর্বার্থসাধিকা হলেই চরিতার্থ হয় নারীর জীবন, পূর্ণ হয় তার সকল আকাঙ্ক্ষা।

নতুন হিন্দুরাষ্ট্রের ট্রেনে মুসলমানসহ অন্য বিধর্মী, কম্যুনিস্ট, স্বাধীনচেতা নারী, LGBTQIA+, বস্তুত আনুগত্যহীন যেকোনো প্রশ্নকারী, প্রত্যেকেই হবে 'দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রী।'

২য়

টেমস নদীর তীরে ৯০০ বছরের পুরনো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। এই ভবনটি বেশ কয়েকবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান আকারে এটি প্রায় ৫০০ বছর ধরে রয়েছে। এমনকি সম্প্রতি, গথিক আর্কিটেকচারের পরিচিত নিদর্শনটির পুনরুদ্ধার এই পার্লামেন্ট। এখানে আছে হাউস অফ লর্ডস, হাউস অফ কমন্স, চার্চ, সিমেট্রি। মাদার অব অল পার্লামেন্ট হিসেবে পরিচিত এই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ওয়েস্টমিনস্টার ব্যবস্থা বিশ্বের শাসন ব্যবস্থার একটি সফল মডেল। ভারত সহ বহু দেশে এই মডেলের গণতন্ত্র চলছে।

একসময় এই ভবনটি বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করত। বিশ্বের প্রতিটি বিখ্যাত ব্যক্তি তার মেঝেতে পা রেখেছেন। এখানে ক্রমওয়েলের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল, এখানে চার্চিলের বক্তৃতা করা হয়েছিল, এখানে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন চিৎকার করেছিলেন "প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে কোন ট্যাক্সেশন নয়।" এই ভবনে

এসে একজন এমপি যুক্ত হন ব্রিটেনের ইতিহাসের সঙ্গে। এখানে থাকা একটি গুরুতর অনুভূতি। তারা এটি সংরক্ষণ এবং এটির আলিঙ্গনে গর্বিত বোধ করে। এই ইতিহাসে তারা বিশ্বাস করে। কোন চকচকে কাচ-সজ্জিত বিল্ডিং, এর সমস্ত জাঁকজমক এবং এলইডি স্ক্রিনসহ, এই গৌরবের সাথে মেলে না। সংসদ সদস্যরা দাঁড়িয়ে থাকবেন, তবে অন্য কোথাও যাবেন না। হ্যাঁ, একবার নতুন ভবনের প্রস্তাবও এলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ক্ষুধা সূচকে ১০১তম স্থানে থাকা দেশ বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন সংসদ ও নতুন রাজধানী তৈরি করছে। ভারতের বুকে এই নতুন শাসনের নিজস্ব স্মৃতিচিহ্ন দরকার। তাই সেই পুরনো ভবন, যেখানে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল, পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। যিনি বসেছিলেন ভারতের সেরা বক্তা, কাউন্সিলর, বক্তা, প্রধানমন্ত্রী, সেরা রাষ্ট্রনায়ক... যেখানে সর্দার, আম্বেদকর, শাস্ত্রী, অটলের কণ্ঠ বেজে উঠেছে, যেখানে ভগৎ সিংয়ের বধিরদের জন্য করা বিস্ফোরণের চিহ্ন নিয়ে একটি স্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে "A Tryst with Destiny" নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যেখানে আমরা পক্ষ ও বিরোধীদের ঐক্য দেখেছি, জনসাধারণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শুনেছে, সেখানে আমরা ভারতের মানুষ... আমাদের সংবিধান লিখেছেন, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি... সেই সংসদ..!

৩য়

ভারতের ইতিহাসে প্রথম কালো দিন ছিল ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮। ঐদিন নাথুরাম গডসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। দ্বিতীয় কালো দিন ছিল ২৫ জুন, ১৯৭৫। ঐ দিন মাঝ রাতে ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধান স্বীকৃত একাধিক মৌলিক অধিকার কার্যত কেড়ে নিয়েছিলেন। তৃতীয় কালো দিন ছিল ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। সিনিয়র

জার্নালিস্ট (দ্যা টেলিগ্রাফ) প্রসূন আচার্য বলেন — '‘আজ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কালো দিন।" ‘কালো দিন’ অর্থাৎ ২৮ মে ২০২৩ (ইং) এই দেশে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সাংবিধানিক চরিত্র কার্যত সমাপ্তি হল। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে পুরোহিত মন্ডিত পরিবেশ দেখানো হয় রীতিমত লাইভ টেলিকাস্ট করে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবসান ঘটিয়ে এটাই ‘আত্মনির্ভর’ ভারত।’

একদিকে দেশের প্রথম নাগরিক অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বক্তৃতায় গণতন্ত্রের পক্ষে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে বড় বড় ভাষণ আর বাইরে যন্তর মন্তরে ৩৪ দিন ধরে চলা মহিলা কুস্তিগীরদের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন কে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে রাষ্ট্রের পেশি শক্তির আস্ফালন হল। প্রতিবাদী কুস্তিগীরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নারকীয় নৃশংসতা আজ দেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে, যা ভারতের উদার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে মারাত্মক আঘাত করেছে। প্রতিবাদী কুস্তিগীরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতায় দেশের গর্বের প্রতীক জাতীয় পতাকাকেও চরমভাবে অপমান করা হয়েছিল। আজ এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক কিছু আর ঘটতে পারে না। বিশিষ্ট জনদের মতে দেশের জনগণ এই ফ্যাসিবাদী রাজনীতিবিদদের জবাব দেবে, যারা প্রতিবাদের কণ্ঠকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়। তারা দেশের অহংকার আর আজ দেশের এই অহংকারদের রাজপথে নির্মম নির্যাতন করা হয়, এমনকি নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিনেও! সাক্ষী মালিক, ভিনেশ ফোগাট ও বজরং পুনিয়ারা আজ যৌন হয়রানি শিকার। তাদের অভিযোগ নাকচ করে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও ধর্নাস্থল থেকে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলে। আমরা যেন ভুলে না যাই দেশের এই বেটিরা- মাতঙ্গিনী হাজরা, রানী লক্ষ্মীবাঈ, সরোজিনী নাইডু, প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরাধিকারী।

দেশের গণতন্ত্র রক্ষার্থে এবং মহিলাদের যথোপযুক্ত সম্মানের দাবিতে এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের পিছনে কিন্তু রয়েছে তারা এবিষয়ে ওয়াকিবহাল সমস্ত গণতন্ত্র প্রেমী নাগরিকেরা।

আসলে কি এটাই আমাদের দেশের উর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের সৌভাগ্য। এটাই কি 'ভারতের মহামানবের সাগর তীর '– মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য খুবই হতাশাজনক। মানুষ যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মানিত হয় না কারণ মানুষ তাদের বোধগম্যতা ও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে আমরা পঙ্গু হয়ে গেছি এটা ইঙ্গিত দেয়। এমন অনেক লোক আছে যারা কোলাহলের অর্থ সম্পর্কে অবগত নয় যে লোকেদের পিছনে ছুটছে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থানে রাজতন্ত্রের প্রতীক 'সেঙ্গেল ' স্থাপন এবং আনুষ্ঠানিক রাজদণ্ড গ্রহণ পুনরায় গণতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রের দিকে পুনর্যাত্রার সূচনার মহড়া হয়ে গেল!! এই নতুন যাত্রাপথে একজনও সাহিত্যিক নেই, কবি নেই, শিল্পী নেই, বিজ্ঞানী নেই, দার্শনিক নেই। আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি- কে সংসদ ভবন উদ্বোধনে ব্রাত্য রাখা হয়েছে। সতীদাহ,বর্ণভেদ, অপবিজ্ঞান, নারীকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও সংখ্যালঘুকে পিষে মারা — ভয় হয় অদূরে কি রয়েছে। ধর্মপ্রবণতা রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যকে গ্রাস করেছে এবং দূরের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে মানুষ নেতিবাচক পরিণতি বুঝতে পারেনি আর যারা ব্যাখ্যা করছেন তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। তাহলে সত্যিই কি আজ অন্ধ, কালা, আর বধির! না, না, "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না!"

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

পরিবেশ সচেতনতা

লিখেছেন - তুষার গরাই



বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি তা যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা বিবিধ যন্ত্রাংশের উৎপত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে গাড়ি, বাইক, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি। জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত যানবাহন এবং যন্ত্রাংশ পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। এইসব গ্যাস বায়ুমন্ডলে সূর্যের বিকিরিত তাপকে ধরে রেখে দেয় ফলে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাসও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এমনকি এসিড বৃষ্টির জন্যও দায়ী।

শিল্প বিপ্লবের আগে ১৭৫০ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরলে বায়ুমন্ডলের মধ্যে CO_2 এর উপস্থিতি ৪০০ পিপিএম বা তার বেশি হয় তাহলে প্রায় দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস এর মত উষ্ণতা বাড়বে পৃথিবীর। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি হবে। দ্বীপ সংলগ্ন অরণ্যভূমি ধ্বংস হবে।

কিছু বিজ্ঞানী গবেষণা করে জানতে পেরেছেন সুমেরু মহাদেশের বড় প্রতিবছর ৪ শতাংশ হারে কমছে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তা জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠবে অর্থাৎ সমস্ত বরফ গলে যাবে। এর প্রভাব ওই অঞ্চলের জীবেদের ওপর পড়বে। দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা জলের নিচে নেমে যাবে। তারা আরো বলেছেন এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সালে আমাদের আরেকটা পৃথিবী লাগবে বাঁচার জন্য। উন্নত দেশ আমেরিকা কানাডার মানুষের মতো বিলাসবহুল জীবন যাপন করলে প্রয়োজন পাঁচটা পৃথিবীর।

আমাদের বাংলার কথা বললে সুন্দরবনের দ্বীপগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। ইতিমধ্যে বহু দ্বীপ সমুদ্র গ্রাস করে ফেলেছে পরিবেশ উদ্বাস্তু হয়ে বহু মানুষ বাসস্থানের জন্য ছোটা ছুটি আরম্ভ করেছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ও রক্ষা নেই। এসব ঠিক যেন হলিউড সিনেমা রোনাল্ড এমিরিকের "দা ডে আফটার টুমোরো" এর মত।

জীবনধারণের তিনটি অপরিহার্য উপাদান: বায়ু, জল, খাদ্য। অবাধ শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রকৃতির সম্পদ শোষণের ফলশ্রুতি হল এ তিনটি মৌল উপাদানের বিশুদ্ধতা অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে গেছে।

বায়ু: শিল্প কলকারখানা থেকে দূষিত গ্যাস নির্গত হয় তার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস এর মাধ্যমে সেই গ্যাস আমাদের শরীরে মেশে। হিসেব কোষে দেখতে গেলে শহর বাসির প্রত্যহ 15 টি সিগারেট খাওয়ার মত ক্ষতি হয়। প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন নেই এবং CO2 ত্যাগ করি। প্রত্যহ আমাদের ঘরে ১৬ কেজি এর মত অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। আবার একটি মোটর বাইক এক হাজার কিলোমিটার অতিক্রান্ত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেন পোড়ায় তাতে একটি মানুষের এক বছর অক্সিজেন যোগান দেওয়া যাবে ওই পরিমাণ অক্সিজেন দিয়ে এক টন কয়লা পোড়ানো যায়।

তাহলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরের পর বছর যে পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহৃত হচ্ছে যার ফলে অক্সিজেনের ঘাটতি তো হচ্ছেই আবার পরিবেশে বিভিন্ন দূষিত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। হেক্টর ঘন অরণ্যে বছরে চার টন CO_2 শোষিত হলে বছরে প্রায় দু টন অক্সিজেন বাতাসে যুক্ত হয়। বছরে প্রায় পাঁচ একরের মত অরণ্য ভূমি ধ্বংস হয় নগরায়নের জন্য। ফলস্বরূপ দেহের জীবনীশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, রোগ বাড়ছে। কলকাতা,দিল্লির মতো উন্নত শহর গুলি দূষণের জন্য উপরের সারিতে স্থান পেয়েছে আর এইসব শহরের জনগণের ফুসফুস জনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জল: দুধের দামে জল বিক্রি হচ্ছে যা মিনারেল ওয়াটার নামে পরিচিত, তাতেও নানা ধরনের কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভূগর্ভের জলকে অবৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করার ফলে আর্সেনিক দূষণ ঘটছে। চাষ জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ধুয়ে নদীর জলে দূষণ ঘটাচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য সমুদ্রের জলে মিশে সমুদ্রে বসবাসকারী জলজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জাহাজ বাহিত খনিজ তৈল দুর্ঘটনাবশত সমুদ্রের জলে দুষণ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এসিড বৃষ্টি: খানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড জল বিন্দুর সাথে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করে এসিড বৃষ্টি। তাজমহলকে এসিড বৃষ্টির প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে কলকারখানা বন্ধের অনুমতি দিয়েছে সরকার।

খাদ্য: কীটনাশক যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছিল ভূপালবাসী। কীটনাশক তৈরির কারখানা নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে তিন হাজার মানুষের নারকীয় যন্ত্রণায় মৃত্যু ঘটে,আহত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুলক্ষ মানুষ। চাষ জমিতে যে পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হচ্ছে তা খাদ্য ফসলের অবনমন ঘটাচ্ছে এবং ওইসব রসায়নিক মানুষের বিভিন্ন

রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী যা নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতালের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যে সংকরায়নের জন্ম দিয়েছে তাতে মানুষ বাদে সব কিছুই এখন হাইব্রিড শিরোপাধারি। যেমন শকুনের জিন মেশানো ব্রয়লার মুরগী নামক প্রাণীটি সভ্য প্রোটিন দেয় আহার্য। যে হারে জিন গবেষণা চলছে তাতে হতভাগ্য মানুষের ভাগ্য খুলতেও বেশি দেরি নেই। যদি এসব ক্ষেত্রে সরকারি ছাড় দেওয়া হয় তবে এমনও হতে পারে কোম্পানিরা উন্নত মানুষের প্রজাতির এড দেওয়া চালু করে দেবে।জেনেটিকালি মডিফাইড সিডস মানুষের স্বাস্থ্যে কতটা প্রভাব ফেলবে তা হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখতে পাবে।

ওজনহোল: সূর্যের ক্ষতিকর আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষাকারী পৃথিবীকে মরে রাখা এই গ্যাসীয় আবরণে ইতিমধ্যে আমেরিকা মহাদেশের মতো আকারে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে ক্লোরো ফ্লুর কার্বন বা CFC, NO_2 এর জন্য দায়ী।

পারমাণবিক পরীক্ষা: আটলান্টিকে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চলাকালীন সমুদ্রের জল প্রায় দেড় কিমি উচ্চতায় উঠে যায়। মাটির নিচে এই বোমার ফলে ভূমিকম্প পর্যন্ত হতে পারে,তাছাড়া ক্ষতিকারক পারমানবিক বিকিরণ তো রয়েছে। চেরনোবিলের পরমাণু রিএক্টটার দুর্ঘটনার কুড়ি মাইল পরিধির মধ্যে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষকে। পৃথিবীর সর্বত্রই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন। এদের থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য মেট্রিকটন তেজস্ক্রিয় ভদ্র পৃথিবীকে ক্রমাগত বিষাক্ত করে তুলছে।

বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক: ১৯৯২ এর জুনে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরও তে পরিবেশ নিয়ে ‘আর্থ সামিট’ নামে রাষ্ট্র কুঞ্জের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়, যোগ দেয় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ। পরিবেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর

আশঙ্কার আলোচনা হলেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তাগিদে পরিবেশকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। আধুনিক সভ্যতার মূলমন্ত্র,প্রকৃতির সম্পদ নিয়ে ভোগ্যপণ্য তৈরি এবং আমৃত্যু সেটির তৈরি যেন প্রধান কাজ হয়ে পড়েছে। যত শিল্পায়নে উন্নত শহর সেখানে তত বেশি পরিবেশ দূষণ। দিন রাত ছোটো, প্রকৃতি থেকে লোটো –এই হচ্ছে আমাদের সভ্যতার মোটো। মানুষের অবিমৃশ্যকারিতায় অপরমেয় নিষ্ঠুরতায় ভেঙ্গে পড়তে বসেছে ইকোসিস্টেম, বিপন্ন হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। একের পর এক বিলুপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির জীব। পৃথিবীতে এযাবত কাল ধরে যে পরিমাণ পরিবেশে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূরণ হওয়ার নয়। বিজ্ঞানীদের দাবি এই অবক্ষয়ের বিপর্যয়কর পরিণাম আরও লক্ষণীয়ভাবে ভয়ানক হয়ে উঠবে আগামী কয়েক দশকে। বিজ্ঞান এত দ্রুত এগোচ্ছে এবং বিজ্ঞান এখন এতটাই বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছে যে বিজ্ঞানীরা যায় করুক না কেন,তাতে কোন আমল পরিবর্তন আসবে না। সুপার সাইক্লোন সুপার ভূমিকম্প সুপার সুনামী সুপার হিট এইসবই অভ্যস্ত হতে শুরু করেছি আমরা আধুনিক সভ্যতাবর্গী মানুষ।

তাছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জের এক সংস্থা ইন্টার গভারমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর সমীক্ষা অনুযায়ী

1. পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি মানুষের কৃতকর্মের ফল –৯০ শতাংশের বেশি তারাই দায়ী।
2. আগামী দশক গুলিতে বিশ্বকে সহ্য করতে হবে ক্রমবর্ধমান অনাবৃষ্টি, তাপপ্রবাহ,আকস্মিক ঝড় প্রভৃতি দুর্যোগ।
3. উত্তর মেরুর বরফ গলে যাবে আগামী 50 বছরে।
4. বিশ্বের সব নদীর উৎস প্রায় সমস্ত হিমবাহ গুলি গলে শীর্ণকায় হয়ে যাবে।

5. সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে এই শতাব্দীতে প্রায় দু ফুট উঁচু হবে পৃথিবীর মহাসাগরগুলি, ডুববে সমুদ্র উপকূলের বিস্তীর্ণ ভুভাগ।
6. তাপমাত্রা বাড়বে ১.৬ ডিগ্রী থেকে ৬.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
7. এই বিপর্যয় চলতে থাকবে আগামী এক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু এতসব হওয়ার পরও কি তেল উৎপাদন ও পোড়ানো বন্ধ হবে? সম্ভবত কস্মিনকালেও নয়। অনিয়ন্ত্রিত লোভই এখন আধুনিক সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ শক্তি। যদি আমরা এমন চরম সময়েও পরিবেশ রক্ষার্থে এগিয়ে না আসি তবে ইতিহাসের পাতায় আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে পরিচিতি পাব। কেবলমাত্র সরকার বা কোন সংস্থার নীতির মাধ্যমে কি পরিবেশে উন্নয়ন আসবে? আমাদের প্রয়োজন নিজে নিজে জীবনশৈলী পরিবর্তন করা যা পরিবেশ মুখাপেক্ষী হবে।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দি করলে, ক্রমে একলক্ষ বন্দি জমে গেল .....। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন– ওদের বধ কর। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন! কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন,আমার দরকার বোধ হচ্ছে না।"

–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রবন্ধ নিবন্ধ

ব্যাড ব্যাঙ্কঃ আরও একটি জুমলা

লিখেছেন - মণীশ রায়চৌধুরী



বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী থেকে মেহুল চোকসি ভারতীয় ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ে বিদেশে ভাগলওয়া হওয়ার তালিকা ক্রমশ বর্ধমান।

এরসাথে আছে যাদের অর্থবলে বলীয়ান হয়ে আমাদের মাননীয় মোদীজি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে আসীন হয়েছেন, আম্বানি-আদানির মত সেইসব ধনকুবের কর্পোরেট গ্রুপ, যাদের প্রতি তিনি এতটাই বন্ধুবৎসল যে প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকা কর্পোরেট ট্যাক্স মাফ করে দিচ্ছেন। ফলে অর্থনীতির ভাঁড়ে মা ভবানী।

কিন্তু সামনে উত্তরপ্রদেশের ভোট আসছে। গত কয়েকটি রাজ্যে বিজেপির ভরাডুবি বুঝিয়ে দিয়েছে গোদি মিডিয়ার দৌলতে প্রধানমন্ত্রীর যে 'বাহুবলী' সুলভ ইমেজ

তৈরি হয়েছিল তা আজ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহলে উপায়! অতঃপর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নিয়ে এসেছেন আরও এক জুমলা তাতে নাকি অর্থনীতি একদম চাঙ্গা হয়ে উসেইন বোল্টের মতো দৌড়বে। কী সেই উপায়? ব্যাড ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের সার্ভিস খারাপ হচ্ছে একথা গ্রাহকেরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন।

কিন্তু, ব্যাড ব্যাঙ্ক আবার কী? আচ্ছা, তাহলে একটু খোলসা করেই বোঝানো যাক। অর্থনীতি কে "চাঙ্গা" করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দুটি নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করছেন 'ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড' এবং 'ইন্ডিয়া ডেট রিজলিউশন কোম্পানি লিমিটেড'।

সে-তো বুঝলাম। কিন্তু, এরা করবেটা কী? প্রথমটি ব্যাঙ্কের সমস্ত অনাদায়ী ঋণ বা অনুৎপাদক সম্পদের (এনপিএ) দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে। ফলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস থেকে তা মুছে গেল। পুরনো ঋণ আদায় না হওয়ার ফলে নতুন ঋণ দেওয়া যাচ্ছিল না, সেই সমস্যা না থাকায় তারা নতুন করে ঋণ দিতে পারবে, ব্যবসা-বাণিজ্যর শ্রীবৃদ্ধি হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি অনাদায়ী কোম্পানির থেকে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে যাবে, এমনকি তা আদায় না হলে কোম্পানির সম্পত্তি নিলাম করে তা আদায় করা হবে। কত সহজ সুন্দর পথ তাই-না?

আরে মশাই দাঁড়ান, এখনই এত নাচবেন না। আগে পুরোটা বুঝুন। ১০০ টাকার অনাদায়ী ঋণের দায়ভার নিয়েই প্রথম সংস্থা ব্যাঙ্ককে ১৫ টাকা মিটিয়ে দেবে, আর বাকি ৮৫ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টার থাকবে ভারত সরকার।

আগামী ৫ বছরের ভিতর দ্বিতীয় সংস্থা ঐ ঋণ আদায়ে অসমর্থ হলে ৮৫ টাকার যতটা আদায় করতে পারবেনা ততটা সরকার ঐ ব্যাঙ্ককে মিটিয়ে দেবে।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন এই গ্যারান্টি মানি হিসাবে কেন্দ্র সরকার ৩০,৬০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। তিনি জানিয়েছেন এই দুটি সংস্থার মিলিত রূপ বা ব্যাড ব্যাঙ্ক ২ লাখ কোটি টাকা এনপিএ'র দায়িত্ব নেবে। প্রাথমিকভাবে ব্যাঙ্ক গুলিকে ১৫% টাকা মিটিয়ে দিতে প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা লাগবে যা শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

বিষয়টি বুঝতে আরও কিছু পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যাক। অর্থমন্ত্রকের তথ্যানুযায়ী ৩১ মার্চ ২০২১ এ ভারতে ব্যাঙ্ক গুলির এনপিএর পরিমাণ ছিল ৮,৩৪,৯০২ কোটি টাকা। ঐ তারিখেই ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ সালে ছিল যথাক্রমে ১০,৩৬,১৮৭ কোটি টাকা, ৯,৩৩,৭৭৯ কোটি টাকা, ৮,৯৬,০৮২ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত কয়েক বছরে অনুৎপাদিত সম্পদ বা এনপিএ কমেছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু, মজাটা হল এক ব্যক্তির আর-টি-আইয়ের জবাবে সরকার জানিয়েছে প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ অর্থকে অনাদায়ী অর্থ ধরে নিয়ে অর্থমন্ত্রক 'রাইট অফ' করে দেয়, পাতি বাংলায় তামাদি ঘোষণা করে দেয়।

২০১৯-২৯ আর্থিক বর্ষে সরকার ১,৭৫,৮৭৭ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ এ ১,৩১,৮৯৪ কোটি টাকা 'রাইট অফ' করে দিয়েছে তার ফলেই এনপিএ কম দেখাচ্ছে।

আমাদের এটাও বিচার করতে হবে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফিন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২২ এর মার্চে এনপিএ প্রায় ৯.৮% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এখনো বোঝেননি? ভাবছেন শুধুই সংখ্যার কচকচি হচ্ছে। তাহলে সোজা ভাষায় বোঝাচ্ছি। মনে করুন নরেনবাবুর বন্ধু মুকেশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ টাকা ধার নিয়েও কিছুতেই শোধ দেননি।

এদিকে কোন কারণে দুপক্ষকেই নিজেদের অ্যাকাউন্টস ক্লিয়ার দেখাতে হবে। নরেনবাবু যেহেতু সরকারের মাথায় বসে আছেন তিনি 'ক', 'খ' নামে দুটি সংস্থা খুলে জানালেন 'ক' সংস্থা ব্যাঙ্কের ঋণের দায়ভার নিয়ে এখনই ১৫ টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে আর ভবিষ্যতে বাকি ৮৫ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছে। 'খ' সংস্থাকে তিনি মুকেশবাবুর থেকে ১০০ টাকা ফেরত আনার দায়িত্ব দিলেন। 'খ' যত টাকা মুকেশবাবুর থেকে আদায় করতে পারবেনা তত টাকা তিনি সরকারের তরফ থেকে ব্যাঙ্ককে মিটিয়ে দেবেন। ফলে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ক্লিয়ার হওয়ায় তারা আবার মন খুলে মুকেশ, বিজয়, গৌতম, মেহুলবাবুদের ধার দিতে পারবে।

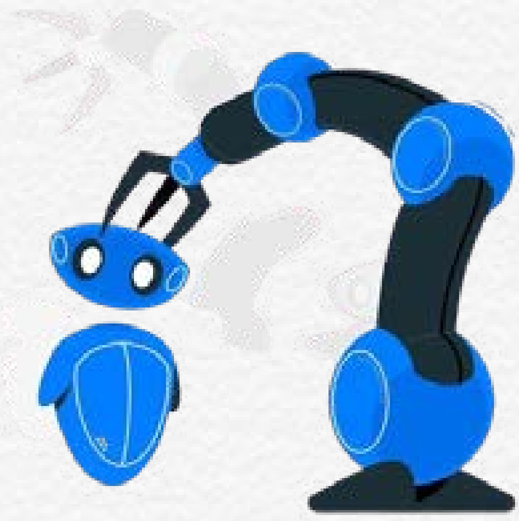
কারণ সরকার তো গ্যারান্টি দিচ্ছেই বছর শেষে সব হিসাব মিলিয়ে দেবে।

তাহলে, খেলাটা কী বুঝলেন? নরেনবাবু মাছের তেলেই মাছ ভাজার মত সরকারের টাকা (যেটা আসলে আপনারই ট্যাক্সের টাকা) দিয়েই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সরকারের অনাদায়ী ঋণ শোধ করে দিলেন। কারণ, নরেনবাবুর সাথে উপরোক্ত বাবুদের যেরকম দোস্তি 'খ' সংস্থা কোনদিনই টাকা আদায় করতে পারবে না। এভাবে বছরের পর বছর চক্রবৃদ্ধিহারে আপনারই টাকা শুষে নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠবে মুকেশবাবু'দের সম্পদের পাহাড়। আপনি বরং হিন্দু-মুসলিম নিয়ে মেতে উঠে "জাতীয়তাবাদী" ললিপপ চুষতে থাকুন।

নিবন্ধ

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করলে লাভের হার কি বৃদ্ধি হয় না কমে?

লিখেছেন - বাসুদেব মজুমদার



এখানে একটা বিষয় খেয়াল করুন তা হলো লাভ বেশী হয়, না কম হয়, সেই প্রশ্ন এখানে নেই। এখানে লাভের হার আর্থাৎ লাভের শতাংশ বা percentage বেশী হয়, না কম হয়, প্রশ্নটা এটা। লাভের পরিমাণ কম বেশী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন নয়। এবার আমরা মূল আলোচনায় যাব। এই আলোচনা খুব জটিল তাই এর কিছু ধাপ আমরা এখানে প্রথম বুঝবার চেষ্টা করবো।

এবার আসুন:

আমরা জানি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভীত হলো জমি, যন্ত্র,পুঁজি ও শ্রমশক্তি। জমি যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু সামাজিক বিচারে তা মালিকের কব্জায়। ফলে সেটিও তার নিজেস্ব। যন্ত্র ও পুঁজি এই দুটিও মালিকের ব্যক্তিগত।

শ্রমশক্তি হলো শ্রমিকের। উৎপাদনের শর্ত হলো মালিক শ্রমিককে মজুরী দেবে। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে কিনবে। মালিকের নির্দেশ ও চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক তার কারখানার যন্ত্রপাতি ও মালিকের দেয়া কাঁচামাল ব্যবহার করে, ও তা মেশিনে চালনা (processing) করে মালিকের নির্দেশ ও চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করবে। উৎপাদিত পণ্য হবে মালিকের। ওখানে শ্রমিকের কোন অধিকার থাকবে না।

এই যে পন্য উৎপাদন হবে তার পিছনে তাহলে কি কি আছে? এক - জমি ও কাঁচামাল যা প্রকৃতির দান বা প্রাকৃতিক সম্পদ। দুই - যন্ত্র। যা সামাজিক শ্রমের ফসল। তিন - পুঁজি। এই পুঁজি হলো যুগ যুগ ধরে মানব শ্রম দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ যা সমাজে গড়ে ওঠে ও সঞ্চিত থাকে। তাই এই পুঁজিও আসলে শত শত যুগের মানবের রেখে যাওয়া শ্রম।

উদাহরণ দিই, চাকা কে উদ্ভাবন করে ছিলেন ? কেউ জানেন না। যিনি বা যাঁরা চাকার উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁরা কেউ জীবিত নেই। কিন্তু চাকা আছে। সেই চাকা সমস্ত সভ্যতার সমস্ত অঙ্গকে সচল করে রেখেছে। চাকা কোথায় নেই? গাড়ি থেকে প্রতিটি যন্ত্র চালাতে লাগে এই চাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এই চাকা লাগে।

কুমারের চাকা হয়ে যে ঘুরতো, তা আজ বিশ্ব সভ্যতার গতি। এই চাকা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রমের দান। তাই শ্রম হলো সমস্ত মুল্য উৎপাদনের শক্তি। একই সাথে পশু পালন, চাষাবাদ বা গাড়ী বা জাহাজ বা এরোপ্লেন এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, ভাস্কর্য এদের আবিষ্কারক, উদ্ভাবক বা স্রষ্টারা কেউ নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রম ও শৈলী দিয়ে যে মুল্য সমাজে সৃষ্টি করে গেছেন তা সঞ্চিত আছে। একেই বলে সঞ্চিত সম্পদ। এই সম্পদ পুঁজি হিসেবে যখন তার শর্ত মেনে উৎপাদনে ব্যবহৃত হলো তখন তা পুঁজিতে রূপান্তরিত

হলো।

তাহলে মূল্য কি? মার্ক্স বললেন “The value of commodities as the amount of labour directly and indirectly necessary to produce commodities” অর্থাৎ, "পন্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যতটুকু পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়, সেটাই পণ্যের মূল্য”। তাহলে শ্রম যত সাশ্রয় হবে, মূল্যও ততো সাশ্রয় হবে। এটাই স্বাভাবিক।

আমরা আগের পর্বে দেখলাম মুল্য হলো পন্য। “উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যতটুকু পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয় সেটাই পণ্যের মূল্য”।

এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রম কি? যে কোন পণ্য উৎপাদন করতে লাগে কাঁচামাল। এই কাঁচামাল হলো সামাজিক শ্রমের ফসল। এ হলো পরোক্ষ শ্রম। যা বিমূর্ত অবস্থায় কারখানায় পৌঁছায়।

এই পরোক্ষ শ্রমের ফসল কাঁচামাল কারখানায় পৌঁছালে, যন্ত্রের সাহায্যে একজন শ্রমিক তার শ্রমশক্তি দিয়ে কাঁচামালকে ভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করে। এ হলো প্রত্যক্ষ শ্রম। এই শ্রমিকরা হলো মূর্ত শ্রমিক।

কাঁচামাল উৎপাদন থেকে finished goods বা ভোগ্য পন্য উৎপাদনের সর্ব ক্ষেত্রে আজ যন্ত্র লাগে। এই যন্ত্রগুলো বহু দিন ধরে স্রেফ মানব শ্রমশক্তি ও তার দক্ষতা দিয়ে চালিত হয়ে উৎপাদন হতো। কিন্তু প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান থেমে থাকে না।

“Technological progress has a long-term labour saving bias”, and that the overall long-term effect of saving labour time in producing commodities with the aid of more and more machinery had to

be a falling rate of profit on production capital, quite regardless of market ...

প্রযুক্তির প্রগতি বা উন্নতিও থেমে থাকে না। ফলে যন্ত্রের উন্নতি হতে থাকে। যার প্রবনতা হলো শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় করা। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই "শ্রম ও সময়ের সাশ্রয়ের" প্রবণতা প্রযুক্তির উন্নতির সাথে ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে। ফলে পন্য উৎপাদনে বহু ধরনের উন্নত যন্ত্র ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবন হতে থাকে ও তা উৎপাদন ক্ষেত্রে বহু মাত্রায় ব্যবহৃতও হতে থাকে। এর ফলে বাজার নির্বিশেষে rate of profit বা লাভের হার কমতে থাকে।

তাহলে লাভের হার কেন কমে ?

উন্নত বহুমাত্রিক ও বহু সংখ্যার যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে। বহু যন্ত্র ব্যবহার হলে rate of profit (লাভের হার) কেন কমতে থাকে ? কারণ capital investment বা পুঁজি নিবেশ বেড়ে যায়। কোন পুঁজির মাত্র সব চেয়ে বাড়ে ? মার্ক্সের ভাষায় Constant Capital বা স্থির পুঁজি। যাকে তিনি C বলেছেন। এই C এর পরিমাণ বেড়ে যায়। আর Variable Capital বা পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ তুলনা মূলক ভাবে কম হলেও সেখানেও পুঁজি নিবেশ বেড়ে যায়। এই Constant Capital বা স্থির পুঁজিতে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিবেশ হয় তার ফলে over head cost প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। এই over head cost কি ? সরাসরি পণ্য বা পরিষেবার উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।

যেমন প্রথমে তো investment এর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ পুঁজির উপরে interest এর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইউটিলিটি, অর্থাৎ উন্নত প্রযুক্তির মেশিন গুলোতে বেশ

কিছু রেকারিং বস্তু অত্যাবশ্যকীয় জিনিস হিসাবে লাগে। সে গুলোর খরচ বাড়ে। বীমার খরচ বেড়ে যায়। কর্পোরেট ফি বাড়ে। নানান আইনি ফি থাকে, যা বাড়ে। অফিসের নানান প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন হয়। তার খরচ বাড়ে। আজকাল অনেক পণ্যে ডেমো ও

সার্ভিস দিতে হয়। তার খরচ বাড়ে। বিজ্ঞাপন খরচ বাড়ে। কারণ উৎপাদন যেহেতু অনেক বেড়ে যায় তাই তার বিক্রীর জন্য যা যা প্রয়োজন পরে সেগুলোর খরচ বেড়ে যায়। শ্রমিক সংখ্যা কমে গেলেও টেকনিক্যালি দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যাদের বেতন বেশী দিতে হয়। এবং অ্যাকাউন্টিং এও দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। যাদের বেতনও অনেক বেড়ে যায়।

তবুও কেন পুঁজিপতিরা এত পুঁজি নিবেশ করে এত খরচা বাড়িয়ে অটোমেশনের দিকে যায়? কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি, যার ফলে Streamlining supply chains অর্থাৎ সাপ্লাইর গতিতে কোন রকম সমস্যা তৈরী হয় না। rejection কমানো, গুণমান আরো বৃদ্ধি করা। এর ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রী বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে overall profits বাড়িয়ে তোলে।

এর গুণমান এত ভাল হয় যে অনুন্নত যন্ত্রের উৎপাদকরা উন্নত যন্ত্রের উৎপাদকদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ও তাতে সফল হতেও অটোমেশন আজ পুঁজিপতিদের কাছে অপরিহার্য হয়ে গেছে।

আর একটা বিষয় হলো অটোমেশনের উৎপাদন ক্ষমতার জোরে, বিক্রীর পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারলে, স্থির পুঁজিতে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হয়, তা বিক্রী বাড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি তুলে নিতে পারলে, মুনাফার হার আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি হয়। তবে এটা নির্ভর করে, কে কত তাড়াতাড়ি বিক্রী বাড়িয়ে স্থির পুঁজির পরিমাণ

তুলে নিতে পারবে তার উপর। সবাই এ কাজ পারে না। কারণ সবার বিক্রী এক নয়। যারা পারবে না, তারা ছিটকে যাবে।

আর একটা শর্ত এখানে আছে। যদি এরই মধ্যে নতুন টেকনোলজি আরো উন্নত যন্ত্র বা অটোমেশন নিয়ে আসে তবে আগের টেকনোলজি দ্রুত obsolete হতে পারে। তাই এই সমস্যাও উন্নত টেকনোলজির যুগে লাগাতার বেড়ে চলেছে। ফলে overall মার্জিন বা মুনাফার হার কমে যায়। অতএব অটোমেশনের ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি হলেও margin of profit কমতে বাধ্য।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই ... বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রবন্ধ

ইসকন কতটা ক্ষতি করছে?

লিখেছেন - মুজিব রহমান



আমেরিকায় ইসকনের যাত্রা শুরু হয়। নিউ ইয়র্কে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভুপাদ খৃস্টানদের চার্চে অধ্যয়ন করেন। পেশায় ছিলেন ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী। ইসকনের পুরো অর্থ হল ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস। ইসকন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুগামী হলেও এটি গীতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভক্তিযোগ এই সংগঠনের মূল উপজীব্য। শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৈষ্ণবীয় বাণীও তারা প্রচার করে। ভগবান কৃষ্ণকে তুষ্ট করাই মূল লক্ষ্য।

এদের সবকিছুতেই শ্রীকৃষ্ণ। পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলেও তারা বলেন হরেকৃষ্ণ। কৃষ্ণ হল ভগবান। অনেকটা একেশ্বরবাদের মতো। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা ইংরেজ আমলে, ইংরেজদের সহযোগিতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একেশ্বরবাদী চেতনায়। ইংরেজরাও ভেবেছিল ব্রাহ্মভাবনা অনেকটাই খৃস্ট ভাবনার মতো হবে। তাতে বৈদিকদের খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিতে সহজ হবে। শেষ পর্যন্ত টিকেনি। ইসকনের কাজ অনেকটা খৃস্টান মিশনারীজের

মতো। শুনি ইসকনের বৈষ্ণবরা বিয়ে করতে পারে না। যদিও নারী কেলেঙ্কারীর বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন সময় ফাঁস হয়েছে। ইসকনের মন্দিরগুলো হয় বৃহদাকার, চাকচিক্যময়। বিশ্বব্যাপী তাদের ৫০ হাজারের বেশি মন্দির রয়েছে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাদের হাতে অর্থ আছে। ইসকনের কর্মকাণ্ডে বিজেপি সরকার ও বিজেপি সমর্থন কিছু ব্যক্তি বিপুল অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাপী।

বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতও ইসকনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ভারত সরকার দুটি ইসকন সেন্টারের উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিচ্ছে।

ইসকন মানুষের জীবনাচার পাল্টে দিচ্ছে। আমার এক হিন্দু কবি বন্ধু বলেছিলেন, 'মাংস খেলে শরীরের মাংস নষ্ট হয়ে যায়'। আমি বুঝে যাই ও ইসকনে যোগ দিয়েছে। বললাম, 'এমনিতেই ভারত বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম মাংস খায়। এসব অপপ্রচার তাদের মাংস খাওয়া থেকে আরো বিরত রাখবে। তাদের মত হলো— মাছ মাংসভোজী যদি পিতা-মাতাও হন, তাদের হাতে রান্না করা খাবার খেলে ভক্তের মন কুলষিত হয় এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারেন না। তাদের বইগুলোতেও বিজ্ঞান বিদ্বেষ প্রকট আবার বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার বেদ থেকেই হয়েছে এমন ধারণা প্রচার করে। ওদের মিথ্যাচার ও ভণ্ডামো নিয়ে অনন্ত বিজয় দাশ লিখে ভণ্ডামো হাতেনাতে প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি খুন হন। তাঁতী বাজারে ‘বেদ থেকে বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার’ এর গল্প অনেক শুনেছি।

ইসকনের ভোজনালয়ে মাঝেমধ্যেই খেতে যাই। জগন্নাথ ভোজনালয় ওই ইসকনদেরই। নিরামিষ খেতে অসুবিধা নেই। তবে পঞ্চগব্য দিয়ে খাবার তৈরি করলে একটু অভক্তি লাগতে পারে। পঞ্চগব্য হল- ঘি, দুধ, মাখন,

গোবর ও গোমূত্র।

ইসকনের প্রকাশিত বইগুলোর অনেকগুলোই খুব দামী কাগজে ও চকচকে বাঁধাই। এসব বইতেই পাবেন সনাতন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। আবার তারাই বিভিন্নভাবে বিবর্তনবাদসহ সংঘাতগুলোর অপব্যাখ্যা দেন। এসব বই পড়া কিছু ছা*গুর লাফঝাপ দেখি, যেন ওরা মহাবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে।

একইরকমভাবে কিন্তু ভিন্নধর্মে বিজ্ঞান দেখান যাকির নায়েক। নায়েকের বেশ কয়েকটি বই পড়েও দেখেছি, তিনি কিভাবে মানুষকে বিজ্ঞানবিমূখ করেন। তাদের অভিন্ন লক্ষ্য মানুষকে বোকা বানানো আর বিজ্ঞান বিদ্বেষী করে রাখা যাতে তাদের প্রতারণা কেউ ধরতে না পারে।

ইসকন শুধু শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করতে চায়। হিন্দু ধর্মের প্রধান দেবতা কি শ্রীকৃষ্ণ? তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কি? আমরা জানতাম এরাই প্রধান দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সুপরিচিত ছিলেন তাঁর প্রেমলীলার জন্য। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকে আরো সামনে নিয়ে আসে।

ইংরেজ আমলে আসা ব্রাহ্ম সমাজের মতোই ইসকনকে মনে হচ্ছে কিছুটা একেশ্বরবাদী। তবে কৃষ্ণ হলেন অবতার, ভগবান এবং শাসক। বৈদিক ধর্মে এখনো শ্রীকৃষ্ণ প্রধান দেবতা নন। সবচেয়ে বেশি পূজাও তিনি পান না। এখনো বঙ্গদেশে প্রধান হিন্দু দেবী হলেন দুর্গা। ব্রাহ্ম ধর্মের কিংবা বৈষ্ণবদের মতো ইসকনেও পুরোহিতদের গুরুত্ব নাই। আমার ফেসবুকে কয়েকজন হিন্দু বন্ধু রয়েছেন যারা ইসকন বিদ্বেষী আবার কিছু আছেন ইসকনপন্থী।

ইসকনের সাথে দুর্গাসহ বিভিন্ন দেবতার অনুসারীদের সংঘাতের খবরও পাই। ইসকন আবার জগন্নাথ দেবকে মানেন। এর একটাই কারণ জগন্নাথ দেব হলেন শ্রীকৃষ্ণেরই

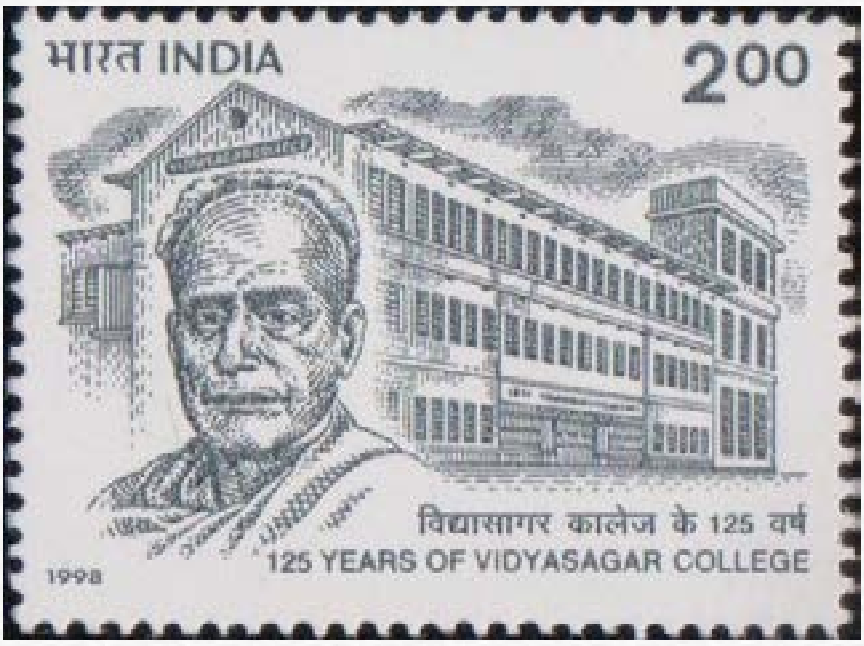
আরেকটি রূপ। তাদের লক্ষ্য হয়তো পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ানো একেশ্বরবাদী খৃস্টান-মুসলিম ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য এনে, হিন্দু ধর্মের বহু দেবদেবীর বহু পূজাকে কাটিয়ে এক কৃষ্ণপ্রেমে মশগুল থাকা। প্রতিদিন ধর্মাচার করার বিষয়টিও তাদের রয়েছে।

ভারতে যেসব হিন্দু গোমূত্র সেবন করেন তাদের অনেকেই (সকলেই কিনা জানা নেই) ইসকন অনুসারী। এক ইসকনি দাবি করলেন ককেসাস (সাদা চামড়া, নাক উচু) জাতিগোষ্ঠীর কিছু মানুষ নাকি ইসকন অনুসারী রয়েছেন। তাদের প্রতিপক্ষরা দাবি করেন' উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্যরাই ইসকন করে। ইসকন নিয়ে আরো কথাও শুনি। যেমন— 'ইসকন মূলত দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে ভেড়ায়'। এটা সবাই করেছে। দরিদ্র মানুষদের সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়। পীরের মুরিদরাও অধিকাংশ দরিদ্র। মাজারপন্থীরা আরো বেশি টার্গেট করে দরিদ্রদের। ইসকন হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথায় বিশ্বাস করে না। এটা যদি সত্যি হয় তবে ধন্যবাদ দিব এটুকুর জন্য। অনেকে দাবি করেন, 'ইসকন সনাতন ধারা থেকে বের হয়ে আধুনিক ধর্মবোধ তৈরি করছে'। তাদের জন্য বলি— ধর্মবোধ কখনোই আধুনিক হয় না। 'মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা' হল আধুনিক চেতনা।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

বিদ্যাসাগরের ধর্ম ও দর্শন

লিখেছেন - শম্ভুনাথ চার্বাক



রামকৃষ্ণদেবের একান্ত শিষ্য ও ভাষ্যকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি শ্রীম নামে খ্যাত, তাঁকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন -- চেঙ্গিজ খাঁ যখন লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? ঈশ্বর কেন এই হত্যা নিবারণ করলেন না? স্রেফ বসে বসে চেঙ্গিজের হত্যালীলা দেখলেন? কাজেই তেমন ঈশ্বর থাকলেই বা মানুষের উপকার কিসের? প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঈশ্বর কি কাজে লাগে? অনাহারে মৃত আবাল বৃদ্ধ বনিতার ঈশ্বর কি কাজে লাগে? সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা দস্যুদের নির্মম হত্যা অত্যাচার নিপীড়ন না থামাতে পারেন; তাহলে তিনি নিত্য মানুষের সঙ্গী কি করে বুঝব? আর যদি থেকেও থাকেন তাহলে কি লাভ হচ্ছে নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের? -- এ প্রশ্ন তিনি বারবার করেছেন।

একবার ব্রাহ্ম্য সমাজের ধর্মীয় প্রচারক শশীভূষণ বসু

এক বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি আসার রাস্তা খুঁজতে রাস্তা গুলিয়ে ফেলেন। তারপর বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরে যখন ঘেমে নেয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি এসে পৌঁছলেন তখন বিদ্যাসাগর কারণ জেনে শশীভূষণ বসুকে রসিকতা করে বলেন --

বিদ্যাসাগরের বাড়ি খুঁজে, বৃদ্ধকে নিয়ে আসতেই এত ঘুরিয়েছ। তখন পরলোকের অজানা পথে যে লোকদের চালান করছ তাদের তো দুর্দশার অন্ত থাকবেনা বাপু। কাজেই এই ব্যবসা ছাড়ো বাপু।

শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথায় জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর সঙ্গে মোলাকাতেও রসিকতার কথা পাওয়া যায়। শিবনাথ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন এবং সেখানে মুড়ি খেতে খেতে প্রবল হাসিঠাট্টা গল্প গুজবে মেতেছিলেন। এমন সময়ে পাশ দিয়ে শিবনাথের পরিচিত এক খ্রিস্টান পাদ্রী শিবনাথকে দেখে সেখানে এসে শিবনাথকে বোঝাতে শুরু করলেন – ব্রাহ্ম ধর্মে কিছু হবে না, আপনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করুন পরলোকে শান্তি পাবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেকথা শুনে পাদ্রীকে ডেকে বললেন, ওরা অল্প বয়সী ওদের পরকাল ভাবার সময় আসেনি, আপনি বরং আমার সাথে আলোচনা করুন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার পরলোকের ডাক এসে গেছে। পাদ্রী প্রবল উৎসাহে বিদ্যাসাগরকে খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর লোকটির নির্বুদ্ধিতা দেখে পাদ্রীর সাথে ঠাট্টা মস্করাতে মেতে উঠলেন। অন্যেরা মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করেছে। একটু পরে পাদ্রী সেটা বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগরকে বললেন - এই বৃদ্ধ বয়সে এমন নাস্তিক আমি দেখিনি, মৃত্যুর পরে আপনার নরকেও ঠাই হবেনা এবং রাগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয় তিনি সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় সাহেবি বেশভূষা ধারণ করেননি। চিরকাল গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিরাচরিত বেশেই ছিলেন। আবার ছোটবেলার উপবীতটিকেও বিসর্জন দেননি। আবার কোনও পূজা আর্চা আহ্নিক বা অন্য কোনও ধর্মীয় আচারে লিপ্ত হতেও কেউ কোনোদিন দেখেনি। পরিবারের দীর্ঘ দিনের বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করে দিয়ে সেই অর্থ গ্রামের দরিদ্র লোকেদের সেবায় ব্যয় করেন। বিদ্যাসাগরের মা ও সেটা মেনে নেন সানন্দে।

ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে তাঁর মনোভাবটি যদি ঐদাসীন্য সংশয় তাচ্ছিল্যের হয় তবে ধর্ম প্রচার ছিল এক্কেবারেই নিখাদ অপছন্দের। “ধর্ম হল দল বাঁধার কাণ্ড” — আখ্যা দিয়ে তিনি ধর্মপ্রচারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্ম্য ধর্মের নেতা কেশব সেনকে নিয়ে তিনি যে পরলৌকিক গল্পটি রচনা করেন ও রামকৃষ্ণদেব ওনার বাড়িতে এলে রামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীম ও অন্যান্যদের শোনান তা টইটুম্বুর হয়ে আছে স্বকীয় কৌতুক ও তাৎপর্যে। তিনি ধর্মোপদেশকে তিনি কি চোখে দেখেন তা রামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন ---- গল্পটি হল কেশব সেনের মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাঁকে নিয়ে গেছে ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর কেশব সেনের অপরাধ বিচার করে পঁচিশ ঘা বেত মারার আদেশ দিলেন, কারণ ঈশ্বর সমন্ধে তিনি শুধু নিজে ভুল বোঝেননি অন্যদেরও ভুল বুঝিয়েছেন। কেশব সেনকে যমদূতেরা বেতাচ্ছে, এমন সময়ে কেশব সেনের শিষ্যরা এসে ঈশ্বরকে বললেন আমরা যা করেছি সব আমাদের গুরুদেব কেশব সেনের ঈশ্বর বিশ্বাসের কথায় প্রভাবিত হয়ে। তখন ঈশ্বর আবার প্রতি শিষ্য পিছু কেশব সেনকে পঁচিশ ঘা করে বেত মারার আদেশ দিলেন। এই বলে বিদ্যাসাগর আবার বললেন ধর্ম প্রচার করলে তাঁর দশা কেশবচন্দ্রের মতোই হবে; আমি পরের জন্য বেত খেতে পারব না। এই গল্পটিই বিদ্যাসাগরের

জীবনীকার শম্ভুচন্দ্রের স্মৃতিকথায় উঠে আসে।

রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের বাড়িতে তাঁর সুবিখ্যাত সাক্ষাৎকারের বা মোলাকাতের সময়েও একই মনোভাব প্রতিফলিত হয়। সে সময়ে নাকি বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার প্রজ্ঞার কাছে বশ হয়েছিলেন বলে একটা সুক্ষ্ম প্রচার আছে; যা এক্কেবারেই হাস্যকর। রামকৃষ্ণের আহ্বানে সমকালীন বাংলাদেশের সব রথী মহারথীরা দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেও বিদ্যাসাগর একবারের জন্যও দক্ষিণেশ্বরে ঢোকেননি। অথচ তিনি দক্ষিণেশ্বরের ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেকবার উত্তরপাড়া ও বালিতে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু যুক্তিবাদী রেনেসাঁসের অন্যতম পথিক অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়ি গিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের কাছে এই নিয়ে খেদ প্রকাশও করেছেন অনেকবার, বলেছেন— সাগর দক্ষিণেশ্বরে আসবে বলেও এলোনা, মিথ্যে কথা বলল এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক কটু কথাও বলেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন এবং কোনও প্রত্যুত্তর দেননি।

রামকৃষ্ণদেবের প্রকট প্রচেষ্টাতেও বিদ্যাসাগরকে নিজের পথে আনতে পারেননি বলে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সশ্রদ্ধভাবে ঐ ডাককে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের মোলাকাতের উক্তিগুলি যেভাবে শ্রীমের কথামৃততে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি সত্য কিনা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনোভাব যাচাই করার উপায় রয়েছে সংস্কৃত কলেজের দলিল দস্তাবেজে এবং বিশেষত ব্যালেন্টাইন রিপোর্টের বিরুদ্ধে শিক্ষা কমিশনার ময়েটের কাছে লেখা পত্রাবলীতে।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম প্রসঙ্গে এমন উক্তি/ মনোভাবের অনেক উদাহরণ আছে। শশধর তর্ক চূড়ামণি তাঁর সাথে দেখা করতে এসে ধর্ম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তিনি হিন্দু ধর্ম তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা নিয়ে অভিযোগ করে বলেন -- ছাত্রাবস্থায় হিন্দু দর্শন পড়ার সময়ে তাঁর পণ্ডিত মশায় যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর বোঝেন কিনা? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন - "আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমনই বুঝি; যেমন পড়াচ্ছেন পড়িয়ে যান। - ধর্ম যে কি বস্তু তা বলা বা বোঝা যায়না, এইজন্য তিনি তাঁর ধর্মমত কাউকে বলেন না। কোনও এক বিশেষ পথে চললেই ঈশ্বর খুশী হবেন এহেন পরামর্শ তিনি মোটেই মানতে পারেন না। এমন সব কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বলেছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য পুণ্যের আশায় শেষ জীবনে কলকাতায় সমস্যা হতে পারে ভেবে কলকাতা ছেড়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন। এসব ধর্ম বিশ্বাসের ধোঁয়াটেপনা। অন্ধত্ব ও হাস্যরসিকতা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাব চাপা থাকেনি। শেষ বয়সে মানুষ দুর্বল হলে নাকি যুক্তি বুদ্ধি ছেড়ে ধর্ম বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে কথাটা একদমই খাটেনি। তাঁর অন্তিম সময়ে তিনি যখন বিছানায় শয্যাশায়ী তখন তাঁর কন্যা তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরই রোগ মুক্তির কামনায় বাড়িতে যজ্ঞের আয়োজন করেন।

কিন্তু পুরোহিতের ডাক এবং কন্যার আকুতি ও একান্ত অনুরোধেও একবারের জন্য নীচে যজ্ঞের স্থানে নামেননি। উপরন্তু কন্যাকে স্বান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, দুঃখ করিস না মা যজ্ঞের ধোঁয়া দোতলায় আসছে।

জীবনের শেষদিনেও পুত্র নারায়ণচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর শরীরে কোনও কষ্ট হচ্ছে কিনা? তখন

বিদ্যাসাগর জবাবে বললেন —তাঁর একমাত্র কষ্ট মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে যেতে পারলেন না।

আমরা সবাই বিদ্যাসাগর নামক সাগরটির উপরিভাগেই সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত; সাগরের গর্ভের মণিমুক্তার হিসেব রাখি না। তিনি শম্ভুচন্দ্রকে স্বহস্তে লেখা পত্রে বলেছিলেন --তিনি দেশাচারের দাস নন এবং আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করলেও তিনি যা উচিৎ মনে করেছেন সেখান থেকে সরে আসবেন না। তিনি ধর্মের কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে কিভাবে লড়েছিলেন; কিভাবে দেশীয় শিক্ষার মধ্যে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান আহ্বান করতে চেয়েছিলেন এবং তার রূপায়ণের স্বার্থে কিভাবে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠ্যসূচী গড়েছিলেন, সেগুলি তাঁর জীবনীকারেরা জানতেন, কিন্তু তার পেছনের মনোভাবটির কথা বোধহয় কেউ জানতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সাল থেকেই সরকারের শিক্ষা সচিব যে এম. মোয়েট সাহেবকে বারবার চিঠি লিখে হিন্দু দর্শনের অসার বাগাড়ম্বরের বিপক্ষে এবং তার কুপ্রভাব তাড়ানোর জন্য আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন লজিক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে প্রবলভাবে সওয়াল করেন, অথচ সে সম্পর্কে প্রকাশ্যে তিনি কিছুই বলেননি। একথা তাঁর সমসাময়িক জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র, চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল মিত্র ও বিহারীলাল সরকারও কেউ জানতেন না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পরে বিদ্যাসাগর গবেষক বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন দস্তাবেজের পাহাড় ঘেঁটে বিদ্যাসাগরের লেখা চিঠিগুলি উদ্ধার করেন। তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা মডার্ন রিভিউতে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং ক্ষোভের সাথে মন্তব্য করেন (১৬, পৃষ্ঠা ৪১) --- ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিদ্যাসাগর কাজের কিছুই

পেলেন না, এ বড় দুঃখের। বলা বাহুল্য গবেষক বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা সচিব মোয়েট সাহেবকে লেখা বিদ্যাসাগরের বিস্ফোরক চিঠিগুলিই বিদ্যাসাগর চর্চার অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার, শিশু শিক্ষার জন্য বর্ণ পরিচয় ও অনেক গ্রন্থ লেখা, সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার জন্য ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা, বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে তৈরি করা, আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি, বাংলা প্রেসের উন্নতি করা, কলেজ ষ্ট্রীটে প্রথম বইয়ের দোকান করা, গরীব দুঃখীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা, নারী শিক্ষার প্রসারে সেই সময়ে ৩৩ টি বিদ্যালয় স্থাপন করা, বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া, বাল্য বিবাহ রদ, বহু বিবাহ রদের জন্য আন্দোলন করেছেন।

বিদ্যাসাগরের জন্ম মাসে ওনাকে আমার শতকোটি প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া, সাত পুরুষের মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভালো হয়।"

–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বনাম যুক্তিবাদ

লিখেছেন - সুদীপ্ত বিশ্বাস

(ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর)



আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কেউ মুসলমান ছিল না। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কেউ হিন্দু ছিল না। কিন্তু তার আগেও বহুকাল ধরে মানুষ ছিল। মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ বা বিভেদ যেটুকু ছিল তা ছিল খাদ্য ও বাসস্থানের। এরপর এল কিছু সুবিধাবাদী চালাক মানুষ। তারাই ধর্ম সৃষ্টি করল। পুঁতে দিল বিভেদের বীজ। এরপর মানুষ মানুষের থেকে এভাবে আলাদা হয়ে গেল যে আজ এতযুগ পেরিয়ে এসেও, এই স্মার্ট ফোনের যুগেও মানুষ এক হতে পারেনি। বরং ধর্মের বিষগাছটি শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মানুষের রক্ত মজ্জায় ঢুকে গেছে।মানুষ হয়ে পড়েছে ধর্মান্ধ। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান চক্ষুর উন্মোচন ঘটায় কিন্তু ধর্মের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষের জীবন, রাজনীতি, চিন্তাভাবনা সব কিছুর মধ্যেই ঢুকে পড়ে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই অতীতকালে কিছু চালাক মানুষের তৈরি ‘ধর্ম’।

ধর্ম আমাদের অন্য ধর্মের মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়। ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। আর সম্প্রদায় থেকেই আসে সাম্প্রদায়িকতা। অনেকে মুসলমান ধর্মের লোকজনকে বিশ্ব সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল সব ধর্মই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়াটাই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্মের প্রধান কাজই নিজের আখের গুছানো আর অন্য ধর্মের নামে কুৎসা রটানো। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম নেই যেটা বলে অন্য ধর্মগুলোও ভালো আর মঙ্গলকর। বরং সব ধর্ম এই শিক্ষা দেয়, যে সেই ধর্মই একমাত্র ভালো আর সব ধর্মই ভয়ংকর খারাপ। এভাবে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে যত লেলিয়ে দেওয়া যায় ততই জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িকতার আগুন। ধর্ম ব্যবসায়ীরা মনের আনন্দে এই আগুন জ্বালিয়ে রাখে আর সাধারণ মানুষ পোকার মত আত্মাহুতি দেয় নিজের বাড়ি, পরিবার এমনকি জন্মভূমিও।

আমাদেরকে বলতে হয় না আমরা আগুনে বিশ্বাস করি, বা জলে বিশ্বাস করি। আগুনে বিশ্বাস করে আগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে, আগুনে অবিশ্বাস করে হাত দিলেও হাত পুড়ে যায়। জলে ডুবে যাওয়ার সাথে জলকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং, যা কিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তা আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের তোয়াক্কা করে না। যার অস্তিত্ব নেই তাকে আমাদের বিশ্বাসে ভর দিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। আমরা যদি ভূত, প্রেত, জীন, পরি, হুর, ঈশ্বর এসবে বিশ্বাস না করি, তাহলে এদের কোনও অস্তিত্বই থাকে না আর। আর তাই আমরা 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বললেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা রে রে করে তেড়ে আসে। আমাদের অন্ধত্বই তাদের ব্যবসার প্রধান মূলধন। মানুষের মধ্যে যত বিদ্যা বুদ্ধি ও বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটে ততই অন্ধকার দূরে সরে যায়। অন্ধবিশ্বাস যত দূরে সরে যায়, প্রকৃত সত্য তত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রকৃত শিক্ষা আমাদেরকে

অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে যুক্তিবাদী হতে অনুপ্রেরণা দেয়।

ঈশ্বর একটা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কেউ অলীক অবাস্তব কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কেউ চায় না। জোর করে কারো উপরেই কিছু চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অলীক ঈশ্বরের কল্পনাতে যারা খুশি থাকেন তারা অন্যদের উপরে সেটা চাপিয়ে দিতে চান। একটা শিশু কোনো ধারণা নিয়ে জন্মায় না। তার জন্মের পরেই তাকে অন্ধবিশ্বাসী করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লাগে বাবা মা ও সমাজ। তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় তার বাবা মায়ের পালিত ধর্ম।তার ভালো লাগা মন্দ লাগাকে আমল দেওয়া হয় না। বড় হয়ে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কেউ যদি কাল্পনিক অলীক ভাবনা নিয়েই খুশি থাকতে চায়, সেটা তার নিজের পছন্দের ব্যাপার। কিন্তু কারো কোনো রাইট নেই তার নিজের কাল্পনিক ধারণা অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়াতে। এই যে “নাস্তিক” শব্দটা, এটাও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শব্দ। যারা ঈশ্বরের কাল্পনিক অলীক ধারণাতে বিশ্বাস করে তাদের বলা উচিত ‘কল্পনা বিলাসী ভাবুক মানুষ’। যারা তা বিশ্বাস করে না তারা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু এই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদেরকেই ‘নাস্তিক’ বলে দেগে দিয়েছে অন্ধবিশ্বাসী মানুষেরা। যেহেতু তারাই দলে ভারি তাই এটা তারা করতে পেরেছে। তবে এটা অন্যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব একমাত্র অলীক কল্পনার জগতে। ঠিক আলাদিনের দৈত্য, রূপকথার গল্পের নায়ক, পাখা ওয়ালা ঘোড়া, ঘোড়ার ডিম বা আকাশ কুসুমের মতোই অবাস্তব কল্পনা হল ঈশ্বর। কেউ এগুলোকে নিয়ে ভাবনার জগতে থাকতেই পারে, এটা তার নিজের পছন্দ। কিন্তু সেটা অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়া, বিশেষ করে শিশুর উপরে চাপিয়ে দেওয়া চরম অন্যায়। এজন্য নিজে অন্ধবিশ্বাসী হলেও বাড়ির শিশুদের মধ্যে সেই অন্ধবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেবেন না। তাদেরকে ঠাকুর পুজো, নামাজ, প্রার্থনা

ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করানো মানেই অন্যায়ভাবে আপনার অন্ধবিশ্বাস তাদের কোমল মনে ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা অনুচিত।ঠিক এই অন্যায়টাই কিন্তু ছোটবেলাতে আমাদের সবার সঙ্গে হয়েছিল। আগামী প্রজন্মকে কী আমরা এই ধরনের অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারি না?

প্রশ্ন করতে শিখলে প্রথমেই আপনার মনে যে প্রশ্নটি আসবে, সেটা হল ঈশ্বর আছে না নেই? উত্তরে আপনি হয়তো ভাববেন নিশ্চয়ই আছে, নাহলে এত সুন্দর জগৎ, এত জীবজন্তু, মানুষ, গাছপালা কীভাবে তৈরি হল? সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। কোনো কিছুই একা একা তৈরি হতে পারে না। প্রশ্ন করতে শিখলে এরপরে আপনার মনে আসবে, তাহলে ঈশ্বরকে কে তৈরি করল? এর উওরে যদি আপনার মনে আসে ঈশ্বর একা একাই তৈরি হতে পারে, তখন আপনার মনে প্রশ্ন আসা উচিত যদি ঈশ্বর একা একাই তৈরি হতে পারে,তাহলে জগতেরই বা একা একা তৈরি হতে বাধা কোথায়? সুতরাং প্রশ্ন করতে শিখলেই উত্তর পাওয়া যায়।

প্রশ্ন করতে শিখলে আপনার মনে হবে ভগবান আল্লা বা গড কী একই না আলাদা? যদি একই হয় তবে এতগুলো ধর্ম আর এত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কেন বানাতে বা লিখতে গেল ঈশ্বর? যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটুও বনিবনা নেই, কাজেই এগুলো বিভিন্ন গড,আল্লাহ বা ভগবানের তৈরি। এত বিভিন্ন গড ঈশ্বর বা আল্লাহরা তাহলে নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে আমাদের মধ্যে কেন মারামারি বাধিয়ে দেয়? প্রশ্ন করতে শিখলে আপনার মনে হওয়া উচিত, ভগবান এসে গীতা কোরান বাইবেল এতসব বই প্রাচীন কালে লিখে গেছিল, এখন আর নতুন বই লিখছে না কেন ভগবান বা গড বা আল্লাহরা?প্রশ্ন করতে শিখলে এসব প্রশ্নগুলো মনে আসবেই। এই যে আগের দিনে এত এত অলৌকিক বাবা, সাধু, ফকিরেরা ছিলেন, এখন আর কেউ

তেমন নেই কেন? বিজ্ঞানের উন্নতি হতেই অলৌকিক বাবাদের কেরামতি সব ফুরিয়ে গেল কেন? বেদে বা কোরানে সব বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বেদ বা কোরানের সাহায্যে সামান্য একটা মগ বা সূঁচ অবধি আবিষ্কার করতে পারল না কেন কেউ? বিজ্ঞান যেই কিছু আবিষ্কার করে, তার পরেই কেন সেই আবিষ্কারের সঙ্গে বেদ বা কোরানের আয়াত বা সুরার মিল পাওয়া যায়? আগে থেকে বেদ বা কোরানের অনুসারীরা কেন কিছুই আবিষ্কার করতে পারে না? প্রশ্ন করতে শিখলেই উত্তর পাওয়া যায়।

প্রশ্ন করতে শিখলে আপনার মনে আসতে পারে,আপনি কে? উত্তর হিসাবে আপনি ভাবতে পারেন আপনি দেহ নন, আপনি আত্মা, অর্থাৎ আপনিই ঈশ্বর। আপনি ঈশ্বর হলে অন্যরাও ঈশ্বর। আবার পিঁপড়ে হাতি কৃমি জীবাণু একই যুক্তিতে ঈশ্বর। আমার আপনার মলের মধ্যে কোটি কোটি জীবাণু বা ঈশ্বর বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

সুতরাং ঈশ্বরকেই আমরা নিজেরা ঈশ্বর হয়েও মল ত্যাগের মাধ্যমে ত্যাগ করছি! বাঘও ঈশ্বর, হরিণও ঈশ্বর। এক ঈশ্বর আরেক ঈশ্বরকে খাচ্ছে। ঈশ্বরই ঈশ্বরের শত্রু। সুতরাং প্রশ্ন করতে শিখলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি ঈশ্বর টিশ্বর নন, আপনি একটা মানুষ, বাঘটা বাঘই, হরিনটা হরিনই,এবং জীবাণুগুলো জীবাণুই। আপনি আত্মা-টাত্মা নন,আপনি আপনিই। একটা মানুষ। দুদিন পরে মারা যাবেন। মৃত্যুর পরে আপনার আত্মা স্বর্গ বা নরক কোত্থাও যাবে না। মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ হয়ে যাবে। স্বর্গ বা নরকের ভুল ধারণা আপনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কিছু ধান্দাবাজ ভণ্ড মানুষেরা। প্রশ্ন করতে শিখলে কেউ মৃত্যুর পরে স্বর্গ বা নরক বোঝাতে এলে তাকে জিজ্ঞেস করুন সে স্বর্গ বা নরকের ব্যপারে কীভাবে জানল? সে কি গিয়ে দেখে এসেছে? সে যদি অন্য কারো থেকে স্বর্গ বা নরকের ব্যপারে শুনে থাকে সেই অন্য কেউ কী গিয়ে দেখে

এসেছে? কেউ-ই যখন মরার পর স্বর্গ বা নরক থেকে ফিরে আসেনি তখন এই কাল্পনিক আজগুবি গল্প যারা রটিয়েছিল তাদেরকে কী আপনি ভণ্ড বলবেন না? প্রশ্ন করতে শিখলে আপনি ঈশ্বরকে মরার পরে স্বর্গ বা অন্যান্য সুখের লোভ দেখানোর চেয়ে জ্যান্ত অবস্থাতে সুখ দিতে কেন বলবেন না? ঈশ্বর এল আইসির প্রিমিয়ামের মতো জ্যান্ত অবস্থায় শুধু স্যাক্রিফাইসই করতে বলে কেন? শুধু মরার পরেই বেনিফিট দেবে যে পলিসি তার কী-বা প্রয়োজন? প্রশ্ন করতে শিখলে আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করবেন সে এত লাজুক কেন? যদি আছেই, তো সামনে আসতে এত ভয় বা লজ্জা কীসের? সবই দেখছে,সবই করছে,কিন্তু নতুন বউ বা লজ্জাবতী লতার চেয়েও লাজুক ঈশ্বর সামনে এসে মুখটা দেখাতে পারে না কেন? এভাবে প্রশ্ন করতে শিখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, ঈশ্বর এক গল্পের গরু যাকে গাছে তুলেছিল কিছু ধান্দাবাজ চালাক মানুষ। তারাই ছিল ধর্ম ব্যবসায়ী বা ধর্ম প্রচারক। আলাদিনের প্রদীপের রূপকথার গল্পের মতো গল্প ফেঁদে ঈশ্বর নামক ঘোড়ার ডিমকে নিয়ে আজও ব্যবসা করে চলেছে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী।

প্রশ্ন করতে শিখলে সবই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।সুতরাং যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করতে শিখুন। 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বা আমিই ঈশ্বর। "তত্ত্বমসি" বা তুমিই ঈশ্বর। এই আমি বা তুমি হল প্রাণ। পিঁপড়েরও প্রাণ আছে। তাই আমি, তুমি ও পিঁপড়ে তিনজনেই ঈশ্বর। এভাবে বাঘ হাতি গণ্ডার ডাইনোসর, এমিবা বা কৃমিদেরকেও ঈশ্বর বলা যায়। কৃমি ছোট ঈশ্বর, গন্ডার, বাঘ বা আমি বড় ঈশ্বর। আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র ও পায়ু অঞ্চলে যে অসংখ্য জীবানু থাকে তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বর। আমাদের মলের সঙ্গেও প্রচুর জীবানু বা ঈশ্বর নির্গত হয়। কারণ, আমি বা তুমি ঈশ্বর হলে জীবানুও ঈশ্বর। এই হচ্ছে ঈশ্বর বিষয়ক মোদ্দা কথা বা খেজুরে যুক্তি। কিন্তু আসল কথা হল এগুলো সব কথার কথা। ঈশ্বর একটা

গুজব মাত্র যেটা রটিয়েছিল কিছু চালাক ধান্দাবাজের দল। তারা বলেছিল আকাশে গড, ঈশ্বর বা আল্লাহ থাকে আর সেই ঈশ্বরকে মন্ত্র বা প্রার্থনা দ্বারা তুষ্ট করার কায়দা তারা জানে। এরাই হল মোল্লা ফকির পাদ্রী বা পুরোহিত বা ধর্ম প্রচারক। এরাই আজেবাজে ধর্মগ্রন্থগুলো নিজেরা লিখে ঈশ্বরের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এই ঈশ্বরের অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে রয়েছে কৃমির মতো একদল পরজীবী প্রাণী তারাই হল সাধু, সন্নাসী বা মোল্লা ফকির। এরা আজকের এই ফাইভ জির যুগেও ঈশ্বর বিশ্বাস বিষয়ক ঢপ দেয়। সাধারণ মানুষের সরলতা আর অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এইসব ঢপবাজেরা কেউ কেউ আবার মহাপুরুষও হয়ে উঠেছে! ঈশ্বরকে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে এইসব সামাজিক পরজীবী কৃমিরা খাবে কী? এরা না খেয়ে মরবে। তাই ঈশ্বরের বেঁচে থাকাটা জরুরি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিছু মানুষ দ্রুত জেগে যাচ্ছে। ফলে ঈশ্বরের মনে হয় আর খুব বেশিদিন আয়ু নেই।

যে কাউকেই খুব সহজে ধর্মীয় মহাপুরুষ বানিয়ে দেওয়া যায়। মানুষ চিরকালই ঈশ্বর ও অলৌকিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। যদি কয়েকজন ব্যক্তি গুজব রটিয়ে দেয় কোনো একজন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা আছে তখন অন্ধবিশ্বাসী মানুষেরা খুব সহজেই তা মেনে নেয়। কেউই প্রতিবাদ করার কথা ভাবে না। এভাবে প্রচার যত বাড়তে থাকে, মানুষের অন্ধবিশ্বাসও বাড়তে থাকে। এভাবে চলতে চলতে গুজবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষটার যখন মৃত্যু হয় তখন ব্যাপারটি আরও জমে ওঠে। এবারে বিভিন্নরকম অলৌকিক ক্ষমতার গল্প রটানো আরও সহজ হয়ে পড়ে।কারণ মৃত ব্যক্তিকে কেউই আর চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। এই সুযোগে আরও জোরদার প্রচার শুরু করে দেয় ভণ্ডের ভক্তের দল। তারা এবারে মৃত ব্যক্তির মূর্তি বানিয়ে সেটাকে পুজো অবধি করতে শুরু করে

দেয়।তার নামের সঙ্গে ঠাকুর শব্দটা জুড়ে দেয়। এরপরে যদি আরও প্রচার চালানো যায় তাহলে ধীরে ধীরে ওই ভণ্ড গুরুটি শিব-কালী ইত্যাদি দেব দেবীর চেয়েও বেশি করে দেওয়া সম্ভব। ঠিকঠাক ভাবে প্রচার বা মার্কেটিং করতে পারলে যে কোনো সাধারণ মানের ভণ্ডকে ধর্মীয় মহাপুরুষ বানিয়ে দেওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, প্রচার ঠিকঠাক ভাবে করতে পারলে বাস্তব অস্তিত্বহীন কোনো অলীক কাল্পনিক ব্যক্তিকেও ধর্মীয় মহাপুরুষ বানিয়ে দেওয়া যায়। চাই শুধু জোরালো প্রচার। এরপর দিকেদিকে গজিয়ে ওঠে অলীক বাবার মন্দির, কোটি কোটি অন্ধবিশ্বাসী মানুষ ভিড় জমায় বাবার মন্দিরে।জমে ওঠে ব্যবসা।

স্কুল কলেজের শিক্ষা পাবার পরেও মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। এর মূল কারণ স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হলেও বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। কুসংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করতে বিজ্ঞানকে কীভাবে জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করতে হয় সেটার শিক্ষা দেওয়া হয় না। এজন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী বা গবেষক হবার পরেও ছাত্রেরা থেকে যাচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞানতার অন্ধকারেই। ধর্মগুলো যে কিছু চালাক ধান্দাবাজ মানুষ নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচলন করেছিল এমন একটা কথাও তারা নিজেদের ছাত্রজীবনে পড়া বা শেখার সুযোগ পায় না। ঈশ্বর যে কিছু চালাক মানুষের রটানো গুজব ছাড়া আর কিছু নয়,এমন একটা বাক্যও তাদেরকে কখনও শেখানো হয় না। ধর্ম বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস যে আমাদের চিন্তাভাবনাকে একপেশে করে দেয়, তা ছাত্রদের শেখানো হয় না। ঈশ্বর বিশ্বাস যে মানুষকে দূর্বল ভাগ্য বিশ্বাসী করে দেয় তা ছাত্রদের শেখানো হয় না।

ঈশ্বর বিশ্বাস না করে,জ্যোতিষ তন্ত্র মন্ত্র, তাবিজ, কবজ, মাদুলি, তেলপড়া, জলপড়া, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, সাধু, ফকির, পীর, অলৌকিক যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস না করে যুক্তিবাদী আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার শিক্ষা স্কুল কলেজে দেওয়া হয় না। উল্টে যে সব শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত তারা নিজেদের অন্ধবিশ্বাস কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। বিভিন্ন ধর্মীয় পুজোতে,ধর্মীয় মহাপুরুষ বা ধর্ম ব্যবসায়ীদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটির ব্যবস্থা কুসংস্কারকে আরও বদ্ধমূল করে দেয় শিক্ষার্থীদের মনে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মুক্তচিন্তা করতে শেখানো হয় না, বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ওঠার শিক্ষা একদিনের জন্যও দেওয়া হয় না,সেই শিক্ষা ব্যবস্থাতে শিক্ষিত হবার পরে কীভাবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী কুসংস্কারমুক্ত, অন্ধবিশ্বাস মুক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে? তারা তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী বা গবেষক ইত্যাদি হবার পরেও অন্ধবিশ্বাসীই থেকে যাবে,এটাই স্বাভাবিক। যতদিন না শিক্ষাব্যবস্থাতে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে শেখানো শুরু হবে,অন্ধবিশ্বাসী না হয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখানো শুরু হবে ততদিন সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব।

Sudipta Biswas,(WBCS Exe.)
Nadia

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না

লিখেছেন - পঞ্চানন মণ্ডল



হালিশহরের সায়কদার কোচিং যথেষ্ট ফেমাস। সায়কদা বিজ্ঞান পড়ান। সায়কদা এবছর থেকে এবার টিউশন পড়ানোর পাশাপাশি আগ্রহী যেকোনো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি মাসের শেষ রবিবার সন্ধ্যাবেলা কোচিং এ বিজ্ঞানের আসর বসান। সেদিন ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাসের বাইরে বিজ্ঞান বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারে। সেইসব প্রশ্নের গল্পচ্ছলে উত্তর দেন সায়কদা। কয়েকটি এমন বিজ্ঞানের আসরে যোগ দেওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ সত্যি চোখে পড়ার মতো। আজ রবিবারের বিজ্ঞানের আসরে সায়নি প্রথম প্রশ্নটা করল,

–আচ্ছা সায়কদা কোনো পশুকে কি পোষ মানানো সম্ভব?

পরিমল – সায়নি, কি ভুলভাল প্রশ্ন করছিস! তুই কি দেখিস নি, না নাকি জানিস না! কুকুর, গরু, ছাগল থেকে শুরু করে বিড়াল, খরগোশ, গিনিপিগ, টিয়া, পায়রা বহু

পশুপাখিকে পোষ মানানো যায়।

সঞ্জয় – আরে আমার বাড়িতেই একটা কুকুর আর দুটি বিড়াল পোষা আছে। আর গ্রামে গ্রামে তো গরুই গৃহপালিত প্রাণী!

সায়নি – এই তোরা থামবি? আমি কি এতোই মূর্খ! আমি কি জানি না কুকুর গরু এরা গৃহপালিত পোষ্য প্রাণী! আমি বন্য পশুদের কথা বলতে চেয়েছি। মানে বাঘ, সিংহ, চিতা এদের।

–তাই বল।

সায়কদা – অনেকে বলেন বনের পশুকে পোষ মানানো সম্ভব নয়। কিন্তু বন্য পশুকে পোষ মানিয়েছে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। যেখানে বাঘ, সিংহ,চিতা,হাতি, ভাল্লুক, সাপ, হরিণের মতো বন্য প্রাণীদেরকে অনেকে পোষ মানিয়ে বাড়িতে পোষ্য রেখেছে!

অপরাজিতা – হ্যাঁ, এমন গল্প অনেক শুনেছি। ইউটিউবে দেখেছি।

বিমল – আমি খবরে দেখেছি। অনেক মালিক তাদের পোষা প্রাণীদের দ্বারাই মারা গেছে। এই তো কদিন আগেই খবরে বলল "পোষা সাপের ছোবলে প্রাণ হারালো এক ব্যক্তি"।

সায়কদা – অনেকেই শখের বসে বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে কাছে রাখে। অনেক বছর ধরেই আরবে, কাতারে বন্য পশু যেমন বাঘ, চিতাবাঘ গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে রাখার নিয়ম ছিল, যা ২০১৫ সালে আরবে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

সায়নি – সত্যি কি বন্য প্রাণীরা পোষ মানে? পোষ মানলে তাহলে তারা তার মালিক বা অন্য কারোর উপর আক্রমণ করে কেন?

সায়কদা – তাহলে একজনের কথা বলি শোন। সেটা ২০০৭ সাল। একজন ‘দ্য লায়ন হুইসপারার’ সম্মান পায়। পূর্ণবত সিংহদের সাথে তার অন্তরঙ্গ ছবি আর ভিডিওর কারণেই তিনি এই সম্মান পান। সিংহদের সঙ্গে নিজের বাড়ির পোষা কুকুর বিড়ালের মতো খেলছেন এমন প্রচুর ভিডিও তিনি ইউটিউবে আপলোড করেছিলেন। সেই ইউটিউব ভিডিওতে ভিউ হয়েছে ১৭ মিলিয়নেরও বেশি। তিনি কেভিন রিচার্ডসন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তাঁর জন্ম। তার ছোটবেলা শহরে কেটেছে। কিন্তু বন্য জন্তু জানোয়ারের প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি অনেকের কাছে বলেছেন “আমি কখনো ভাবিনি যে আমি পশুদের নিয়ে কাজ করবো”। তবুও তাঁর পশুপাখিদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্ম হয়। ছোটবেলায় পরিবারের সাথে বহুবার দক্ষিণ আফ্রিকার চিড়িয়াখানা ও গেইম-রিজার্ভ পার্কগুলোতে গিয়েছেন। একবার রডনি ফুর নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। কেভিনের পশুপ্রেম দেখে ফুরের ভালোলাগে। ফুরের মাধ্যমে আফ্রিকার একটি সিংহ রিজার্ভ পার্ক, ‘লায়ন পার্কে’ সিংহ দেখাশোনার দায়িত্ব পান কেভিন।

এরপর থেকে তিনি যেন তাঁর পশুপ্রেম থেকেই দুটি সিংহের বাচ্চা একটির নাম টাও ও অপরটির নাম নেপোলিয়ন কে লালন পালন শুরু করেন। তাঁর কথায় তিনি এই সিংহদের পোষ মানাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা খেলাধুলা করায় তাদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুধু সিংহ নয় হায়েনাদের সাথেও কেভিনকে খেলাধুলা করতে দেখা গেছে। তবে কেভিন কিন্তু কোনো শখের পশুপ্রেমী ছিলেন না। বন্য পশুদের সংরক্ষণ তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। তার মূল লক্ষ্য ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বে বিলুপ্ত হতে চলা বাঘ, সিংহ, হায়েনা, চিতা

ও অন্যান্য বন্য প্রাণীকে শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের প্রজনন ঘটিয়ে বংশবৃদ্ধি করা। তাই লায়ন পার্কে কাজ শেষ করে রডনি ফুরের সহায়তায় ৮০০ হেক্টর জমির উপর তিনি একটি রিজার্ভ ফরেস্ট তৈরি করেন- নাম দেন 'দ্য কিংডম অব দ্য হোয়াইট লায়ন'। কারণ ২০১০ সালে দ্য হোয়াইট লায়ন মুভির শ্যুটিং এখানে হয়েছিল। এই মুভিতে কেভিনের একটি সিংহকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

কিন্তু এটা কেভিনের নিজের কেনা জায়গা ছিল না, ভাড়া করা জায়গা ছিল। তাছাড়া এতো বিশাল বিশাল সিংহের রিজার্ভ চালানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই কেভিন তার সিংহগুলো বিভিন্ন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করেছিলেন ও নিজে বেশ কিছু তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, যা থেকে তিনি অর্থ পেতেন। সেই অর্থ জমিয়ে ২০১৫ সালে ব্যক্তিগত মালিকানায় দক্ষিণ আফ্রিকার সুদূরে ওয়েলজগ্যাট গেইম রিজার্ভ নামে একটি পশু সংরক্ষণ ক্ষেত্র তিনি তৈরি করেছিলেন।

এ পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন পার্কে স্কুল প্রজেক্টের জন্য রিজার্ভের ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে এসেছিলেন ২০-২২ বছরের দুই তরুণী। তাদের মধ্যে একজন তার প্রজেক্টের জন্য পার্কের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলছিলেন। সেই সময় কেভিন ও তার সহকর্মী ৩টি বড় সিংহকে পার্কে হাঁটার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাঁটার আগেই তিনি পার্কের সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা হাঁটতে বেরোচ্ছেন। কিন্তু একটি হরিণকে তাড়া করতে গিয়ে একটি সিংহ দলছুট হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সেখানে পার্কে একা দাঁড়িয়ে থাকা সেই তরুণীকে সিংহ দেখে ফেলে এবং আক্রমণ করে। যার ফলে মর্মান্তিক ভাবে তরুণী মারা যান।

এই ঘটনা কেভিনের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। কারণ

"যে সিংহটি তরুণীকে আক্রমণ করেছিল সে আদৌ বন্য পরিবেশে জন্মায় নি বা বড় হয় নি। বরং পার্কেই তার জন্ম হয়েছিল। কেভিনের মতে মানুষ দেখে অন্য বন্য প্রাণীর মতো ভয় না পেয়ে সে আক্রমণ করার সাহস পেয়েছে!

বিমল – আচ্ছা সায়কদা, সে যদি বন্য আচরণ একসময় করবে, তাহলে জন্মের পর থেকে তাদেরকে ঘরের পরিবেশে পোষ মানানোর পরও তাদের মূল বন্য স্বভাব কেন লোপ পায় না? আর যদি লোপ নাই পাবে, তাহলে কেন কিছুদিন তারা পোষা প্রাণীর মতো আচরণ করে? কেভিনের সিংহটি কেভিনের সাথে এত বছর পোষা প্রাণীর মতো আচরণ করার পর কেন হঠাৎ হিংস্র হয়ে একজনকে আক্রমণ করল?

সায়কদা – কেন তারা পোষ মানলেও বন্য থেকে যায় তার পুরো সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে বহু গবেষণা করছেন। তার কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি।

কোনো প্রাণীকে গৃহপালিত বা পোষ্য করার প্রক্রিয়াটি হাজার হাজার বছর পুরানো। দু-চার বছরে তা হওয়ার নয়। তাই লীলা মজুমদারের একটি গল্পের কথাই অনেকাংশে সত্যি। "বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায় কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।"

আর আমরা যতই ভাবি যে কোনো প্রাণীকে 'আমরা' নিজেরা পোষ মানিয়েছি, আসলে সেটি সেই প্রাণীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাদের বিবর্তন ও জেনেটিক গঠনের উপরও অনেকটা নির্ভর করে।

সায়নি – কিভাবে?

প্রকৃতপক্ষে কোনো বন্য প্রাণীই স্থায়ীভাবে গৃহপালিত নয়। তোরা জানিস বিড়াল আর কুকুরকে আমরা সবাই গৃহপালিত বলি। কিন্তু এদের পূর্বপুরুষেরা সবাই বন্য ছিল। বিড়ালের আগে কুকুরকে মানুষ পোষ মানিয়েছে। ঠিক

কবে থেকে, তার সঠিক সন্ধান পাওয়া না গেলেও অনেক গবেষক মনে করেন, মানুষ তার কৃষিকাজের জন্য গরুকে ব্যবহারের আগে কুকুরের ব্যবহার শুরু করেছিল। তবে অন্যদের মতে, কুকুর আরও আগে, যখন মানুষ অন্য বন্য প্রাণী শিকার করে জীবিকা চালাত, তখন থেকেই মানুষের সাথে আছে এবং পারস্পরিক সহাবস্থানে চলে এসেছে। অন্যদিকে, কুকুরের আদি পূর্বপুরুষ, বন্য ধূসর নেকড়েগুলো আজ বিলুপ্ত, কারণ মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা মানুষের সাথে সহাবস্থানে যেতে পারেনি।

অপরাজিতা – ও তাহলে এইসব কুকুরও বন্য ছিল?

সায়কদা – একদম, বিড়াল অন্যদিকে নিজে নিজেই গৃহপালিত হয়েছে তা আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে। তবে এখনো তোদের বাড়ির পোষা বিড়ালের সাথে তোদের যে ধরনের সম্পর্ক, ১০,০০০ বছর আগে মানুষের সাথে বিড়ালদের সে সম্পর্ক ছিল না। বিড়াল মানুষের সাথে তার পরিবেশকে খাপ খাইয়েছে। বিড়াল কুকুরের চেয়ে তুলনামূলক স্বাধীন বলা চলে। বেঁচে থাকার জন্য কুকুরের মতো মানুষের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। বিড়াল মানুষের সমাজে আসে তখন, যখন মানুষের ঘরের শস্যের মধ্যে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে। তাই বলা যায়, বিড়াল তার নিজের সুবিধার জন্যই মানুষের সাথে মনিব-ভৃত্তের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

সায়নি – তাহলে বিড়াল, কুকুর কি পুরোপুরি মানুষের পোষ মেনেছে?

সায়কদা – তা বলা যাবে না। বিজ্ঞানকথা গ্রুপের এক আলোচনাতে এক সদস্য ভিডিও দিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি দুগ্ধপোষ্য বিড়ালছানা তার মার নিয়ে আসা ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে তাকে মেরে ফেলেছে! অনেকে দেখবি বাড়ির খুব পোষা কুকুরের দ্বারাও জখম হয়। তার মানে বিড়াল বা কুকুর এত হাজার বছরের গৃহপালিত

জীবন পার করার পরও তাদের শিকারী মনোভাব ও পশুত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারে নি। তাই গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালরাও মানুষকে জখম করে। দুধ খাওয়া বিড়ালও ইঁদুর মারে! সেখানে বাঘ, সিংহ, হাতি, হায়েনা বা সাপের মতো প্রাণীদের কাছ থেকে আমরা কীভাবে গৃহপালিত পশুর আচরণ আশা করতে পারি?

বিমল – তাহলে কুকুর বিড়াল এরাও তো দেখছি ঠিক পোষ্য নয়। সত্যি তো বাঘ সিংহ পোষ্য হবে কিভাবে!?

সায়কদা – কারা পোষ্য আর কারা পোষ্য নয় তা নিয়ে বিখ্যাত প্রাণী ও ভূতত্ত্ববিদ জ্যারেড ডায়মন্ড তার বই 'গানস, জার্ম ও স্টিল' 'এ পোষ্য প্রাণীর ৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ৬টির মধ্যে যদি একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যও না থাকে, তাহলে সে প্রাণীটিকে গৃহপালিত বলা যাবে না, বা কখনো পোষ্য বানানোর চেষ্টা করা হলেও তাকে পোষ্য বলা যাবে না!

১ নম্বর – গৃহপালিত পশুরা মানুষ তার মতো বুঝে যা দেয় সব খায়। যেসব প্রাণীর খাবারের ব্যাপারে বাছ-বিচার আছে, বা যেসব প্রাণী মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সাথে মানিয়ে চলতে পারে না, তারা কখনো গৃহপালিত হবে না।

২ নম্বর – যারা অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনের ধাপগুলো পার হয়ে যায় মানে যাদের আয়ু কম তারা গৃহপালিত হতে পারবে। যেমন – কুকুর বা বিড়াল সর্বোচ্চ ১০-১২ বছর পর্যন্ত বাঁচে। এই অল্প সময়ে তারা মানুষের সমপর্যায়ের একটি জীবন উপভোগ করে। যেসব প্রাণীর জীবনসীমা মানুষের মতো দীর্ঘ, তাদের পোষ মানানো যায় না। সেইজন্য বাঘ সিংহ পোষ্য হওয়া সমস্যার।

৩ নম্বর – যেসব প্রাণী বদ্ধ পরিবেশে সন্তান জন্ম দিতে পারে, তাদের গৃহপালিত করা যাবে। যাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রজননের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন, তাদের পোষ্য

হওয়া চাপের।

৪ নম্বর – পোষ্যরা ভয় পেলে বা মানুষের দ্বারা তাড়িত হলে বেশি দূর যায় না বা খুব বেশি ভীত হয়ে পড়ে না, আবার সেই মানুষের কাছে আশ্রয় খোঁজে।

৫ নম্বর – স্বভাবে তুলনামূলক নরম ও শান্ত প্রকৃতির হলে গৃহপালিত করা যাবে। কারণ এই নরম আর শান্ত স্বভাব সে বিবর্তনের মাধ্যমে পেয়েছে।

৬ নম্বর – তারা একটি সহজাত শ্রেণীকাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে একজন দলনেতা থাকে। তবে এক্ষেত্রে বিড়াল ব্যতিক্রম, কারণ বিড়ালদের সমাজে শ্রেণী-কাঠামো নেই।

তোরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস এই ৬টি বৈশিষ্ট্যের একটিও সিংহ, বাঘ, হায়েনা, হাতি, সাপ বা অন্যান্য কোনো বন্য প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। তাই তাদেরকে বিড়াল, কুকুরের মতো পোষ মানানোর প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় বন্য প্রাণীদের উপর শখের মানুষদের এ একধরনের অত্যাচার। মনে রাখতে হবে “বন্যেরা বন্যে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে”।

সায়নি — তাহলে কেভিনের মতো মানুষেরা বন্য পশুদের পোষ মানালো কিভাবে?

সায়কদা — হ্যাঁ, ওনারা কিছুটা পোষ মানান বটে কিন্তু জিনগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকেই যায় বলে কখনো কখনো তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

হলিউডের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সিংহ ও বাঘ প্রশিক্ষণের জন্য বিখ্যাত প্রাণী প্রশিক্ষক পল রেনল্ডস বলেছেন – “বন্য পশুরা কখনো আপনার বন্ধু হতে পারবে না। আপনার ভালোবাসাতে তারা কিছুটা তাদের বন্য স্বভাব ভুলে থাকে মাত্র। তাই আপনাকে তাদেরকে ভুলিয়ে কাজ করিয়ে

নিতে হবে। ভালোবাসতে হবে, পর্যাপ্ত খাবার দিতে হবে। তারা তখনই আপনার কথা শুনবে। তাছাড়া তারা যখন বুঝবে আপনি তাদের উপর হুকুম করার যোগ্য। এভাবেই তাদেরকে সম্মোহিত করতে হবে।”

সায়নি – আরেকটি প্রশ্ন সায়কদা, বন্য প্রাণী পোষ না মানলে কেভিন কী করে তার সিংহদের পোষ মানাতে পারলেন?

সায়কদা – এর উত্তর আগেই দিয়েছি। প্রকৃত পোষ সেই সিংহরা মানেনি। কারণ পোষ্য হতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা তাদের নেই। তাই তারা পরে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল।

তবে কেভিনের উদ্দেশ্য খুব মহত ছিল। তাঁকে যেসব সিংহের সাথে ধস্তাধস্তি করতে দেখা যায়, সেসব সিংহকে কেভিন জন্মের পর থেকেই লালনপালন করে আসছিলেন। আর তিনি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে সিংহ, বাঘ বা হায়েনা সহ সকল বন্যপ্রাণী আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজন, তাই তাদের ভয় কাটানোর জন্যই আমি সিংহদের সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তুলি।”

তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, মানুষ যাতে এসব বন্য প্রাণীকে শুধুই হিংস্র প্রাণী হিসেবে না দেখে অন্যান্য প্রাণীর মতোই দেখে। বন্যপ্রাণী, বন্যজীবন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তিনি এসব করেছেন। কারণ বন্যপ্রাণীরা মানুষের জন্য ভয়ের কারণ হলেও তাদেরও এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আছে। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় সকল উদ্ভিদ প্রাণীর গুরুত্ব আছে। আজ বিশ্বায়ন ও নগরায়নের ফলে বহু বন্যপ্রাণ সংকটের মুখে। প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। শিকার ও বাসযোগ্য স্থানের অভাবে দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বহু বন্য জীবন। তাই আমাদের সবার উচিত বন্যপ্রাণী, বনজঙ্গল ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

রম্য রচনা

ইন্সটলমেন্টে গ্রহ পাওয়া যায়

লিখেছেন - জাভেদ ইকবাল



কলাবাগানের চিপা গলি দিয়ে হাটার সময় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। "ইন্সটলমেন্টে গ্রন্থ পাওয়া যায়"

দিনের পর দিন বাসা-অফিস-বাসা করতে করতে বিরক্ত আর একঘেয়ে লাগছিল। আজকে পেয়াজের দাম বেশি, কালকে সয়াবিন তেল; ইন্ডিয়া চাঁদে গিয়েছে নাকি সব সিজিআই ফেইক, দিন-রাত এই সব আর্থ সামাজিক সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করে যাচ্ছে ফেইসবুকের বিশেষজ্ঞরা, আর আমি হাঁসফাঁস করছি গরমে আর বৃষ্টিতে আর ট্র্যাফিক জ্যামে।

এখনও কি বইকে গ্রন্থ বলে কেউ? মনে হয় বয়স্ক কারুর লেখা। মিনিট খানেক হেটে যাওয়ার পরে মনে হলো, সম্ভবত আমি পড়তে ভুল করেছি। তাই বার ফিরে গিয়ে দেখলাম, এবং চিটচিটে গরম এক সেকেন্ডের জন্য ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম। এতদিন ফেইসবুকে বিজ্ঞাপন দেখেছি, জ্যোতিষী রকেট পাঠিয়ে গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন

করে ভাগ্য বদলে দেবেন। এরা কারা বাওয়া, যারা বাসায় গ্রহ ডেলিভারি দিয়ে যাবে? শ্লা পাগল ছাগলের কারবার… ফোন বের করে একটা ছবি তুলি আমি। ফেইসবুকে আমার বেশি বন্ধু নেই, তাও এই ছবি পোস্ট করলে ১৫-২০টা লাইক পেতে পারি। নন্দিনীর চোখে কি ছবিটা পড়বে? খুব ইনটেলিজেন্ট একটা ক্যাপশন দিতে হবে; নন্দিনী যেন ক্যাপশনটা দেখে ইম্প্রেসড হয়। সে যদি কমেন্ট করে, তাহলে আমি সেটার উত্তর দেব। আমার কমেন্টে যদি সে লাভ দেয়, তাহলে তাকে আমি ইনবক্সে মেসেজ দিতে পারব… এই সব আবোল তাবোল ভাবনার মধ্যে পিচ্ছিল কিছু একটায় পা পড়ে। তাল সামলে অতি ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি, রঙ হলুদ হলেও এটা কারো প্রীতি উপহার নয়, কলার খোসা। যাক, ভাগ্যদেবী আজকে আমার ওপর প্রসন্ন।

চিলেকোঠায় আমার এক রুমের ভাড়া বাসা। ছাদে কোন বাথরুম নেই, দরকার হলে নিচে নামতে হয়। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে বাড়িওয়ালার ওয়াইফাই তে কানেক্ট করলাম। ব্যাটা খাটাস এর জন্য আমার কাছ থেকে মাসে ১০০ টাকা বেশি নেয়, আবার রাত ১১টার পর বন্ধ করে দেয় যাতে তার মেয়ে কারুর সাথে প্রেম না করতে পারে। এই আমার জীবন।

ছবিটা পোস্ট করে দিলাম। সাথে ক্যাপশন দিলাম, “ঢাকায় নিজের বাড়ি নেই বলে যে সব মেয়ে ও তার মা-বাবা আমাকে পাত্তা দেয় নাই, তারা এখন পস্তাবে, কারন আমি অচিরেই নিজস্ব গ্রহের মালিক হতে যাচ্ছি”।

৪২ মিনিট হয়ে গিয়েছে পোস্ট করার। ১০টা হাহা আর একটা লাইক পড়েছে। যে লাইক দিয়েছে, সে আমার ফ্রেন্ডও না… অথচ আমার ১০০% হাহা নষ্ট করে দিল শালা নচ্ছার। এদিকে ছয় বার চেক করেছি, নন্দিনীর প্রোফাইলে সবুজ বাতি জ্বলছে। সে অন লাইন, কিন্তু আমার পোস্টে কোন রিঅ্যাকশন নেই। নন্দিনীর নিউজফিডে কি আমার

পোস্ট যায় নাই? নাকি সে দেখেও ইগনোর করছে? করতেও পারে...

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ফোনটা তুলে নিয়ে বিজ্ঞাপনের ফোন নাম্বারটা গুগল করলাম, যদি আর কোন তথ্য পাওয়া যায়।

কিছুই নেই। শালারা বিটলা, ফ্রড নিশ্চয়। নন্দিনী এখনও পোস্ট দেখেনি, অথবা দেখলেও রিঅ্যাক্ট করে নি। মোট ১৭টা হাহা আর সেই এক হারামজাদার লাইক এখনও ঝুলে আছে। আর চারটা হলেই নতুন রেকর্ড হবে আমার পোস্টে।

আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? ব্যাটাদের ফোন করি। তারপর সেই কথাবার্তাগুলি দিয়ে একটা নতুন পোস্ট করব। পর পর দুটা পোস্ট নন্দিনীর চোখে পড়বে না, সেটা কি সম্ভব? রি অ্যাক্ট বা কমেন্ট না করলেও সে নিশ্চয় একটু মুচকি হাসবে... এভাবেই বরফ গলানো শুরু করতে হবে।

"স্লামালিকুম।গ্রহলাগবেডটকমএ স্বাগতম।একশতভাগ পানিতে ঢাকা গ্রহ, অক্সিজেনের গ্রহ, হাইড্রোজেনের গ্রহ, সোনায় মোড়া, বরফে ঢাকা, যে রকম গ্রহ লাগবে আমরা তাই দিতে প্রস্তুত। আমার নাম যূথিকা। স্যার বা ম্যাডাম, আপনার নামটা জানতে পারি?"

আমি কিছুটা ভড়কে যাই। হোয়াট? গ্রহলাগবে ডট কম? তাহলে এরা অনলাইন বিজ্ঞাপন না দিয়ে দেয়ালে পোস্টার মারছে কেন?

"আপনাদের কোম্পানিটা কোথাকার? ইন্ডিয়ান নাকি?"

"হা হা স্যার, আপনি খুব রসিক মানুষ। না না, আমরা ইন্ডিয়ান না"।

যূথিকা অনেক যত্ন করে আমাকে সব বুঝিয়ে দিল। হ্যা, আসলেই গ্রহ ডেলিভারি করা হবে। হ্যা, আমি যেমন চাইবো, তেমনই। গ্যাসের তৈরি গ্রহের চাইতে সোনা

মোড়ানো গ্রহের দাম এমন কিছু বেশী না। আজব ব্যপার হচ্ছে, পানি বা বরফের গ্রহের দাম সবাইতে বেশী। যূথিকা পানি দুষ্প্রাপ্য বা এমন কি একটা বলছিল, আমি ঠিক বুঝি নাই।

বিভিন্ন সাইজের গ্রহও আছে। কথা বলতে বলতেই তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রহের ছবি আর সাইজ পছন্দ করে নিলাম। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৫০ কিলোমিটার, সেটার সাথে মিলিয়ে আমি ৬.৩৫ মাপের একটা গ্রহ নিলাম। অদ্ভুত সুন্দর রঙ রজনীগন্ধার ডাটার মতো কোমল সবুজ ঘাসে ঢাকা। পাঁচ নাম্বার ফুটবলের চাইতে একটু বড় হবে। টেবিলের ওপর রাখবো, মন খারাপ হলে, একা লাগলে, বিষণ্ণ লাগলে কল্পনা করব ঐ গ্রহের ঘাসের ওপর নন্দিনী আর আমি শুয়ে আছি।

দাম? আশ্চর্যরকম সস্তা। যূথিকা ডেলিভারিও ফ্রিতে দিতে রাজি হয়ে গেল। তবে সেটা পাঠাও না সুন্দরবন কুরিয়ারে আসবে জিজ্ঞেস করায় মনে হলো সে একটু থতমত খেয়ে গেল।

"স্যার, আমাদের ডেলিভারি সার্ভিস নিজস্ব। আপনাদের এলাকায় আমরা নতুন, তাই এখনও লোকাল কারুর সাথে কোন চুক্তি হয় নাই। ভবিষ্যতে হবে হয়তো"।

দিন পার হয়ে সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ হয় মাস। যদিও তারা বলেছে তিন মাস লাগবে, এবং ক্যাশ অন ডেলিভারি হওয়ায় টাকা মার যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তবুও অস্থির লাগতে থাকে। গ্রহ লাগবের ওয়েব সাইটে গিয়ে মাঝে মাঝে নির্মানাধীন গ্রহটা দেখি। শুরুতে যেরকম উত্তেজনা লাগতো, এখন সেটাও ফিকে হয়ে আসছে।

তারপর একদিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি টেক্সট মেসেজ: "আমাদের ডেলিভারির রকেট আপনার এলাকায় আজকেই পৌঁছে গিয়েছে। সেখান

থেকে গ্রহ ডেলিভারি শুরু হবে, আপনার কাছে পৌছাতে তারপর আর দেরি হবে না। অনুগ্রহ করে বাসায় থাকবেন; অথবা নির্ভরযোগ্য কারুর হাতে প্রথম কিস্তির সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে রাখবেন"।

হা হা হা। হালার পো আসছে বাইসাইকেলে বা মোটর সাইকেলে করে, লিখেছে রকেট। সেন্স অফ হিউমার ভাল আছে ব্যাটাদের।

মেসেজটার স্ক্রিনশট নিয়ে ফেইসবুকে পোস্ট দিয়ে দিলাম। "বন্ধুরা, আমার নতুন গ্রহ দেখার দাওয়াত রইল সবার। ডাল ভাত কিছুই খাওয়াতে পারব না, তবে টোস্ট আর দুধ-চিনি ছাড়া চা চললে এসে পড়"।

কী ব্যাপার? অ্যাংরি আর স্যাড রিঅ্যাকশন আসছে কেন? এমনকি, এমনকি আমার পোস্টে নন্দিনীর প্রথম অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু হাহা না দিয়ে স্যাড দিল কেন? তাহলে তো এখন তাকে মেসেঞ্জারে জিজ্ঞেস করতেই পারি। ব্যাপারটা মন্দ হলো না।

আমি কিছু করার আগেই জোসেফ নামের কেউ একজন কমেন্ট করে যায় প্রথম আলোর স্ক্রিনশট সহ, "বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে এলিয়েন স্পেইসশিপ। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বিশাল গ্রহাণু"।

কাঁপা কাঁপা হাতে গ্রহলাগবে কে ফোন করি আমি। এবারও ফোন ধরে যূথিকা। "স্যার, কোন সমস্যা? আমরা তো ট্র্যাক করছি সব কিছু সময় মত পৌছে যাবে"।

"যুথিকা, যূথিকা, আমার গ্রহের সাইজ কত?"

"স্যার, দেখে বলছি। এই যে, আপনার কথামতই ৬.৩৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গ্রহ"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছি ৬.৩৫ সেন্টিমিটারের গ্রহের মডেল অর্ডার করেছি। আমি নিজে ১.৭৫ মিটার, আমি যে গ্রহে থাকি, সেটাই ৬.৩৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গ্রহ। দুই

গ্রহের সঙ্ঘর্ষ হওয়া লাগবে না, মাধ্যাকর্ষনে প্রথমে আমাদের চাঁদ ছিটকে যাবে, তারপর যে জোয়ার উঠবে তাতেই সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।”

“খুবই দুঃখিত স্যার। মনে হয় আমাদের স্কেল বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। আপনারা আকারে এত ছোট আমরা বুঝতে পারি নি। মনে হচ্ছে আপনাদের সভ্যতা কার্দাশেভ স্কেলে এখনও শূন্যতে পড়ে আছে। আমরা বিজ্ঞাপনটা আউটসোর্স করেছিলাম, পুরা পয়সা লস হলো”।

হাত থেকে ফোনটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

“যূথিকা, আপনারা কত দূরে? আমি কীভাবে আপনাদের সাথে ফোনে কথা বলছি তাহলে? গ্রহটা পৃথিবীতে আছড়ে পড়া থামানোর কোন উপায় আছে?”

“না স্যার। এটা এখন নিজস্ব গতিতে চলছে, থামাতে গেলে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করা লাগবে সেটা আমরা যথাসময়ে ঐ কোয়াড্রেন্টে পৌছাতে পারব না। তবে হতাশ হবেন না স্যার। আমদের সার্ভিস ১০০% গ্যারান্টিড। প্লিজ স্যার, আন্তর্নাক্ষত্রিক ভোক্তা অধিদপ্তরে কমপ্লেইন করবেন না; আমার চাকরিটা গেলে না খেয়ে থাকতে হবে। যদি কোন ভাবে বেঁচে যান, আপনাকে আলডেব্রানে সাত দিনের ফ্রি ট্যুরের একটা কুপন দেয়ার ব্যবস্থা করব"।

আর কতক্ষণ বাকি? পাবলিক যদি টের পায় এটা আমার অর্ডার, আমাকে তো পিটিয়েই মেরে ফেলবে। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে আমার।

ফোনটা হাত থেকে পড়ে যায় ঠকাস করে আমার বুকের ওপর, এবং চমকে উঠে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। আনলক করে আমার পোস্টে যাই, এবং জোয়ার ডাকে আমার মনে। ২৬ টা হাহা, একটা লাভ, দুইটা লাইক, চারটা কমেন্ট। আর কমেন্টে জ্বলজ্বল করছে একটা নাম... নন্দিনী: “গ্রহ কিনলে ট্রিট দিতে হবে কিন্তু। শুধু চা তে হবে না”।

ছবি ফেইসবুকে পাওয়া। ছবি দেখে গল্পটা মাথায় এলো।
কার্দাশেভ স্কেল: রাশান বিজ্ঞানী নিকোলাই কার্দাশেভ পৃথিবী ও এলিয়েন সভ্যতা কতটুকু শক্তি ব্যবহার করতে পারে, সেটার ওপর সভ্যতাকে টাইপ ০, ১, ২ ও ৩ স্কেলে ভাগ করেছিলেন। সেটাকে কার্দাশেভ স্কেল বলা হয়। তারপর অন্যরা সেটার সাথে টাইপ ৪ ও ৫ যোগ করেছেন। পৃথিবীর মানুষ এখনও জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে, তাই আমরা শূন্য তে আছি। টাইপ ১ সভ্যতা নিজের গ্রহের সব জ্বালানী ব্যবহার করতে পারবে, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সাইক্লোন এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
টাইপ ২ সভ্যতা একটা নক্ষত্রের সব শক্তি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। টাইপ ৩ সভ্যতা একটা গ্যালাক্সির সব শক্তি অর্থাৎ সব নক্ষত্রের ও ব্ল্যাক হোলের শক্তি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
বিস্তারিত: https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale



প্রবন্ধ - নিবন্ধ

ধর্মের কারবারিদের থেকে সতর্ক থাকুন

লিখেছেন - দিলীপ দাস মণ্ডল



প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থাৎ পূজা, আরাধনা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি করার জন্য খরচ করবো কেন? এ সকল কাজের জন্য আমরা যে খরচ এবং সময় ব্যয় করি তার থেকে আমরা সত্যিই কি প্রত্যাশা ফেরত পাই? যা যা পাবার আশা করে আমরা ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা করি তার পুরো ফায়দা নেয় পুরোহিত শ্রেণী আর শাসক শ্রেণী, আর কিছু লোক সুযোগ নেয় যারা ধর্মের কারবার করে। আমারা যারা উপরের ঐ সকল শ্রেণীর লোক নই তাদের সতর্ক হতেই হবে যে শুধু-শুধু ধর্মীয় সংস্কৃতির পেছনে অর্থ এবং সময় খরচ করে নিজের আখের নষ্ট যাতে না হয়।

ধর্মীয় ব্যবসার লাভ যারা ওঠায় তারা কায়দা করে ধর্মীয় সংগঠন সুদৃঢ় করেছে বহুকাল ধরে বহু ফন্দি ফিকির করে। আর আমরা সাধারণ মানুষেরা তাদের চালাকির ফন্দি ধরতে না পারার জন্য বোকার মত তাদের সংগঠনকে বড় করছি আর নিজের সময় এবং অর্থ নষ্ট করছি। ধর্মের কারবারিরা আমাদের সমাজকে যেভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে তার থেকে বেরিয়ে আসা অত সহজ নয়, তা জেনেই

আপনাদের সতর্ক করছি এবং আপনাকে নিজেকেই তৈরী করতে হবে এই সমাজে থেকেই শুধু শুধু সময় এবং খরচের অপব্যবহার রোধ করার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে ধর্মের সবচেয়ে বড় দুটো হাতিয়ার ঈশ্বর এবং আত্মা আসলে মিথ্যা দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে। আসলে ঈশ্বর নেই এবং আত্মা অমর মিথ্যা প্রচার। ঠাকুর, দেবতা, গড, আল্লা, ভগবান, ইত্যাদি চরিত্রগুলো যেহেতু আসলে নেই, তারা তোমার আরাধনায় কখনোই সাহায্য করতে আসেনি আর ভবিষ্যতেও আসবে না বা তুমি আরাধনা না করলে তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারবে না।

মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস মূলত সূর্য। সেই সূর্যও আলাদা করে পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে চলছে বা চলবে তাও আলাদা করে প্রকৃতি কোনদিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ও পরে পারবেও না। এ ঘটনাগুলো প্রধানত সূর্য থেকে আগত শক্তিগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। প্রকৃতিকে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ করা গেছে সেগুলো সবই মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের ফল।

যারা এই সমাজ থেকে মানুষের প্রধান চাহিদার জিনিস খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ন্যূনতম যতটা প্রয়োজন ততটা পাচ্ছে না তারা কখনোই ধর্মের কারবারিদের প্ররোচনায় পড়ে ধর্মের পেছনে খরচ এবং সময় ব্যয় করবে না। বরং এর পেছনে যে খরচ এবং সময় রেখেছে তা বন্ধ করে উপরের পাঁচটি জিনিস যাতে একটু ভালভাবে হয় তার চেষ্টা করা প্রধান কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে ধর্মের কারবারিরা আপনাদের প্ররোচিত করবার জন্য মাঝে মাঝে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াবে এবং সমাজের নিচু শ্রেণীর (অর্থনৈতিক) লোকেদের একত্রিত হওয়া বন্ধ করবে।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

মহাজীবনের ধূসর শৈশব

লিখেছেন - বিশ্বদীপ ভট্টাচার্য



মানুষটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র থেকে বিদ্যাসাগর হবার লংমার্চে শারীরিক ও মানসিকভাবে যে বন্ধুর চড়াই উতরাই পথ তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছিলো তা ছিলো রীতিমতো দুরূহ। প্রথমতঃ তাঁর সারা গায়ে বীরসিংহ নামক এঁদো গ্রামের মাটির গন্ধ মলমের মতো মেখে ছিলো, তার ওপর পারিবারিক এবং সামাজিক কোনও ধরণেরই প্রতিপত্তি ছিলো না, এবং ছিলো না কোনও ধনকৌলিন্য, এই ত্র্যহস্পর্শ মাথায় নিয়েই শিশুটি কলকাতার মাটিতে পা রেখেছিলো। কিন্তু ছিলো দুর্মদ জেদ ও অনন্ত জ্ঞানস্পৃহা এছাড়া আরও অনেক অপার মানবিক অনুভূতি যা তাঁকে পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র থেকে বিদ্যাসাগরে পরিণতি দিয়েছিলো। পড়াশোনার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্রও শিথিলতা ছিলো না বরং ছিলো অসীম আগ্রহ। একটুকরো ছোট্ট উদাহরণ এখানে টেনে আনা যেতেই পারে। রাত

দশটায় যখন ঈশ্বর ঘুমোতে যেতেন তার আগে বাবাকে বলে রাখতেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে যেন তাঁকে ডেকে দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক বাবা আর্মানিগীর্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলেই তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিতেন। অবশিষ্ট রাত তিনি অধ্যয়নে নিবিষ্ট হতেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ছিলো তাঁর কাছে সাধনা কিংবা তপস্যার মতোই। ঐ "Three Kinds of People Keep Awake the Whole Night - Yogi, Bhogi and Rogi…." মনুষ্যত্বরে সাধনায় শৈশব থেকেই নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে নিজেই নিজেকে "Right To Education (RTE)" এর সীমানাধীন করেছিলেন।

ঠাকুরদাসের মাসিক দশ টাকার বেতন থেকেই দেশের বাড়ি ও কলকাতার বাসার চারটে পেটের অন্ন সংস্থান সহ যদ্-যাবতীয়ব্যয়নির্বাহহতো।একেবারেটানাটানিতেই।যার ফলে হাসিমুখে দারিদ্রকে নিত্যসঙ্গী বলে মেনে নিয়েছিলো শিশুটি। আজকের শিশুশ্রম আইন এর চশমা লাগিয়ে যদি বিদ্যাসাগরের শৈশবকে খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে বাসন মাজা, বাজার করা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, কচি হাতে কাঠ চ্যালা করে উনুন ধরানো মায় রান্না করা, সেই রান্না করা খাবার খেয়েই বিদ্যালয়ে যেতে হতো তাঁকে। তখন আজকের মতো মিড ডে মিল এর ব্যবস্থাপনা ছিলো না। এবং শরীরটি ক্ষুদ্র ও মাথাটি বড়ো হবার কারণে তাঁকে পাড়ার বাচ্চারা যোশুরে কৈ অপভ্রংশে কশুরে জৈ বলে খেপাতো। তখন ছিলো না কোনও অ্যান্টি রাগিং সেলও।

এতাবত গ্রার্হস্থ্যে লিপ্ত থেকেই তাঁর কেরিয়ার শুরু হয়েছিলো। তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় আজকের মতো দেশি বিদেশী লগ্নী পুঁজিও ছিলো না এবং নামীদামী ঝাঁ চকচকে বিলাসবহুল অফিস ও গাড়ি ব্যবহারকারী এন.জি.ও.-র দলবলও ছিলো না তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবার মতো। সুতরাং অচিরেই ঈশ্বরের কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবার কথা

ছিলো। কিন্তু হলো তার উল্টো। হয়ে উঠলেন তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রগতি-বিমুখ সমগ্র বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকা থেকে আজকের স্মার্টফোনের যুগে নিত্য় অনুধ্যন করবার মতো মায়েস্ত্রো ব্যক্তিত্ব।

আশ্চর্যের বিষয় উল্লিখিত গৃহকর্মে তাঁর বিরক্তি তো ছিলই না বরং সোত্সাহে সেই শ্রমসাপেক্ষ কাজ তিনি সম্পন্ন করতেন। দারিদ্র্যের পীড়া বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, “কখনও অন্ন জুটিত কখনও জুটিত না। যখন ভাত জুটিত তখন হয়তো ব্যঞ্জন থাকিত না, নুনভাতে দিন কাটাইতে হইতো। যখন মাছ ও তরকারি পাইতাম, তখন ঝোল রাঁধিয়া এক বেলার ভাত ঝোল দিয়া খাইতাম, বিকালের ভাত তরকারি দিয়া খাইয়া মাছ পরদিনের জন্য রাখিয়া দিতাম। সেই মাছে পরদিন অম্বল রাঁধিয়া উহা ভাত দিয়া খাইতাম”। মানুষটি যেন আজকের পুষ্টিবিদ বা ডায়েটিশিয়ান এবং বেবিফুড প্রস্তুতকারক দেশি-বিদেশি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন যে কতোটা ‘নুন-ভাত’ পেটে পড়লে অমন একটা আস্ত বিদ্যাসাগর তৈরি হওয়া যায়?

মাত্র বারো বছরের বালক বিদ্যাসাগর গেলেন সুপন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মশাইএর কাছে কাব্য পাঠ করতে। গোল বাধলো তার বয়স নিয়ে, অতটুকু পুঁচকে ছেলেকে সেখানে উনি তাঁকে নিতে চাইলেন না। অতঃপর নিজের জ্ঞানের পরীক্ষা দিয়ে নেহাতই বালককে সেখানে উজ্জ্বল স্থান করে নিতে হলো। এটা উল্লেখ করবার মতো দিক যে সারাটি জীবন বারবার নিজেকে প্রমাণ করা এবং উত্তীর্ণ করা ঈশ্বরের স্বভাবজাত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কাব্যের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে বিদ্যাসাগর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘব-পান্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেন। দ্বিতীয় বর্ষে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোবর্ষী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী ও

দশকুমার-চরিত প্রভৃতি কাব্য কণ্ঠস্থ করে আবার শীর্ষস্থান দখল করলেন। সারাজীবন সর্বক্ষেত্রে স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে শীর্ষস্থান ধরে রাখাটা যেন তাঁর স্বত্তাধিকার হয়ে রইলো।

শোনা যায় ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে কঠোর অনুশাসন ও নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে রাখতেন। ছোট্ট ঈশ্বর যে-দিন যা পড়তেন ঘরে ফিরে অবিকল বাবাকে তা শোনাতেন, একটি শব্দও এদিক ওদিক হলে শাস্তি পেতে হতো। আজ তো পড়াশোনার কারণে শাস্তি পাওযার ব্যপারটাই উঠে গেছে। সমাজে স্থান করে নিয়েছে কাউন্সিলিং, মেন্টরিং এরকম কতো নতুন ধরনের শব্দগুচ্ছ। চালু হয়ে গেছে ব্যানিং অফ কর্পোরাল পানিশমেন্ট অ্যাক্ট পাশাপাশি এস.সি.পি.সি. আর, এন.সি.পি.সি.আর এরকম আরও কতো কী। তবুও আজকের শিশু শিক্ষা কোথায় যেন . . . . . .।

আজও তাঁকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। কত মানুষ তাঁদের সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলেন শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর গবেষণায় লিপ্ত থেকে। আরও কতো, কতো মানুষ আগামীতে তাঁকে নিয়ে চর্চা করবেন 'জীবনের ধ্রুবতারা'-র মতোই। বীরসিংহ থেকে কার্মাটড় এক যুগান্তকারি বাতিঘরের মতোই ঈশ্বর যেন আজও দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সঠিক দিশা দেখাবার জন্য তাঁর বিদ্যাসাগরীয় মেজাজেই।

অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা

নিবন্ধ

শংকর জীবের কবলে হুজুগে বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতি

লিখেছেন - শাহাদাত হোসেন



সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে কৃষ্টি শব্দটির পরিবর্তে বাংলায় এর প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়।

সংস্কৃতি হলো কিছু বুনিয়াদি অনুমান, মূল্যবোধ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির, বিশ্বাস, নীতিমালা, প্রক্রিয়া এবং আচরণিক প্রথার অস্পষ্ট সমষ্টি—যা এক দল মানুষ ভাগ করে নেয় এবং সেই সমষ্টি দলের প্রত্যেক সদস্যের আচরণকে এবং তার নিকট অন্য সদস্যের আচরণের 'অর্থ' বা সংজ্ঞায়নকে প্রভাবিত করে।

সংস্কৃতির প্রকাপশিত রূপ হল শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, অনুষ্ঠান, ধর্ম, রান্না করা, ঘর, বাড়ি এবং কাপড় চোপড় ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সমূহ যাহা মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে।

পান্তা ভাত কেউ ইচ্ছা করে খেত না। পূর্বে বিদ্যুৎ ছিল না, ফ্রিজের ব্যবহার ছিল না। তাই কোন কোন সময় যখন রাতের খাবার থেকে যেত তখন সেগুলোকে গরম করে রাখা হতো এবং বাত পানি দিয়ে রাখা হত - যাতে সেগুলো নষ্ট না হয়। সকালে যখন কাজে যেত তখন সে খাবার তারা খেয়ে যেত।

সেই সময়ে ইলিশ পাওয়া যেত কেবলমাত্র ইলিশ ধরার মৌসুমে অর্থাৎ বছরে মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। সুতরাং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ইলিশ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার যে একটি রেওয়াজ চালু করা হয়েছে তা কখনোই বাঙালির সাংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারেনা। এর মাধ্যমে কোন উৎকৃষ্ট চিন্তা ও অভ্যাসের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না। বরং এর মাধ্যমে পরিচয় করানো হচ্ছে পূর্বে বাঙালি বাঁশি পচা খাবারের অভ্যস্ত একটি নোংরা জাতি ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ ধার্মিকের বীজে কিছু সংকর জীব তৈরি হয়েছে। তাদের ধন দৌলত হয়েছে, সার্টিফিকেট রয়েছে, সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। তাই ধর্মের কঠিন বিধি নিষেধ এখন আর এদের ভালো লাগেনা। সুন্দরী নারী ও পুরুষদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সাথে নিজেদের প্রগতিশীল রুপে মানুষের কাছে মেলে ধরতে এদের ভালো লাগে।

জীবনে আনন্দ উল্লাস এদের মূল লক্ষ্য। এরা কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না। এরা মনে প্রাণে ধার্মিক কিন্তু বেশভূষায় নাস্তিক। শুধু নিজেদের জ্ঞানীগুণী প্রকাশ করতে এরা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় মুক্তমনা হিসাবে। এরা কখনোই চায়না এদেশে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিলোপ হয়ে মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটুক। মনে প্রাণে চায় নবীর আদর্শের অনুসারী।

তাছাড়া একজন নাস্তিক হওয়ার জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজন তা এই

সমস্ত ফালতুদের নাই এবং কখনোই হবে না।

এই ফালতু মূর্খ আড্ডাবাজ শংকর জীবেরা একেক সময় একেক জিনিস সমাজে চালু করে দেয়। পান্তা ইলিশ হল এই ফালতু মূর্খ স্মার্টদের নব আবিষ্কার। যা কোন রোগ বিচার বিশ্লেষণ না করেই হুজুগে বাঙালিরা গ্রহণ করে ফেলেছে।

এই শঙ্কর জীবেরাই এখন বাজারে নতুন একটি ডায়লগ নিয়ে এসেছে এবং সেটি হল মুক্তমনারা থাকবে মুক্ত। তারা কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারেনা। হোক সেটি প্রগতিশীল ও মুক্তমনাদের সংগঠন। এই বাটপারেরা বলে এতে করে নাকি মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়? অথচ অন্ধুত্ব দূর করে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই হলো মুক্তমনা সংগঠন সমূহের অন্যতম লক্ষ্য।

তাদের মতে মুক্তমনারা মুক্তভাবে সব জায়গায় যাবে। তারা মন্দির, গির্জা, পেগোডায় যাবে। ইচ্ছা করলে নামাজও পড়বে। কারণ এটিও বাংলাদেশী সাংস্কৃতির অংশ।

আসল কথা হল মেয়েদের নিয়ে আড্ডা মারা হইহুল্লোড় করার মধ্যে আনন্দ আছে। সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটা লাভজন ও নিরাপদ কিন্তু মুক্তমনাদের সংগঠনের যুক্ত হওয়া বিপদজনক ও অলাভজনক।

এই শংকর জাতীর ধার্মিক গরুরা নানা সময়ে এদেরকে নানারকম বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষতি সাধন এবং নাস্তিকদের আন্দোলনকে দুর্বল করার নানা রকমের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে থাকে। ধর্ম ব্যবসায়ী বাটপারেরা জানে মুক্ত চিন্তাকরা একবার সংঘটিত হতে পারলে তাদের ধর্ম ব্যবসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই মুক্তমনাদের যেকোন উপায়ে হোক বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

শিশুদের কীভাবে সু-অভ্যাস গড়ে তুলবেন

লিখেছেন - রাজু দত্ত



অভ্যাস হল সেই আচরণ যা বারবার অনুশীলনের ফলে এমন ভাবে অর্জিত হয়, যে একসময় তা স্বতস্ফুর্তভাবে ঘটতে থাকে। এই আচরণ যখন আমাদের বৃদ্ধি -বিকাশ ও সুস্থ স্বাভাবিক সর্বাঙ্গিন সুন্দর জীবন গঠনে সহায়ক, তখন তাকে সু-অভ্যাস বলা হয়। অন্যদিকে কু-অভ্যাস হল ঠিক এর বিপরীত, যা আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গিন সুন্দর জীবন গঠনে অন্তরায়। কাজেই সু-অভ্যাস গঠন করা যেমন আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তেমনই কু-অভ্যাস বর্জন করাও অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের কর্তব্য বাল্যকাল থেকেই যাতে শিশুরা সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জন করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করা। শিশুর অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতি-

ঐতিহ্য শিশুমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া এই ব্যাপারে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রথম বাল্যকালে সু-অভ্যাস রপ্ত হতে থাকলে, উত্তর বাল্যকালে তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে গৃহীত হতে থাকে। আমাদের জীবন সুস্থ স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গিন সুন্দর করে গড়ে তুলতে সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জন অত্যন্ত জরুরি।

বাল্যকাল থেকেই শিশুর সু-অভ্যাস গঠনে আমরা কীভাবে উদ্যোগী হতে পারি। আসুন তার একটা ধারনা দেবার চেষ্টা করা যাক। ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার উপকারিতা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। তাই শিশুর মধ্যে যাতে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ার অভ্যাস গঠিত হয়, সে দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। ভোরবেলা নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে উঠতে হলে রাতে নির্দিষ্ট সময় ঘুমিয়ে পড়া জরুরি। দৈনিক সাত আট ঘণ্টা ঘুম আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। শিশুদের ক্ষেত্রে এই সময়ের তারতম্য হয়। অর্থাৎ শিশুরা একটু বেশিই ঘুমোতে পারে। শরীর সুস্থ রাখতে ও স্মৃতিশক্তিকে ক্ষুরধার করতে পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত জরুরি।

শিশু যাতে নির্দিষ্ট সময় পরিমিত সুষম আহার গ্রহণ করতে পারে, সে দিকে খেয়াল রাখুন। শিশুর সুস্থ শরীর গঠনে প্রয়োজন খেলাধুলা ও শরীর চর্চা। স্মার্টফোনে বা কম্পিউটার গেমে শিশুকে আসক্ত হতে দেবেন না। সে দাবা, ক্যারাম বোর্ড, লুডো খেলুক, লুকোচুরি, ধরাধরি, কুমির ডাঙা, কিতকিত খেলুক, ক্রিকেট, ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন খেলুক, দৌড়াক, সাইকেল চালাক, সাঁতার কাটুক। তবেই সে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠবে।

যে সময় যে কাজটি করা প্রয়োজন, সেই সময় সেই কাজটিই যাতে শিশু করতে পারে, সেদিকে নজর দিন।

স্নান, খাওয়া, পড়তে বসা, টিভি দেখা, প্রভৃতি সকল কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন। সম্ভব হলে সেই সময় সেই কাজটি আপনিও করুন। যেমন, ধরুন ঘুম থেকে উঠে আপনি নিজের বালিশ চাদর মশারি ইত্যাদি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখবেন, দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পর আপনি দাঁত মাজবেন, মিষ্টি বা চকোলেট জাতীয় খাবার খেয়ে অবশ্যই কুলকুচি করে মুখ ধোবেন, স্নানের পর আপনার ভিজা পোশাকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে শুকোতে দেবেন, খাওয়ার পর ব্যবহৃত বাসন বেসিনে রাখবেন অথবা মেজে নেবেন ইত্যাদি। শিশুর ব্যক্তিগত কাজ তাকে নিজে হাতে করার শিক্ষা দিন। শিশু আপনার এই সকল আচরণ অনুকরণ করতে করতে একসময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন তাকে আর বারবার এগুলি করার জন্য বকাবকি করার প্রয়োজন হবে না।

মনে রাখবেন শিশু তত্ত্বকথা বোঝেনা, সে বড়োদের আচরণ অনুকরণ করে। তাই শিশুর সান্নিধ্যে থাকার সময় আপনি আপনার আচরণ সঠিক, সংযত ও যুক্তিসম্মত করে তুলুন। শিশুর নম্র আচরণ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সে আপনার আচরণ অনুকরণ করবে। কাজেই এই বিষয় অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন এটা কখনো বিস্মৃত হবেন না।

বই, টিভি, বা স্মার্টফোনে ছবি দেখিয়ে নয়, শিশুর সাথে প্রকৃতির পরিচয় ঘটান প্রত্যক্ষভাবে। সরাসরি তাকে আমাদের চারপাশের গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়ের সাথে পরিচিতি ঘটানো দরকার। সেইসাথে শিশু যাতে গাছ লাগানো ও গাছের পরিচর্যা, পশু পাখি প্রতিপালনের শিক্ষা, তাদের প্রতি মমত্ববোধের শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকে নজর দিন।

শিশুর কৌতুহলের যথাসম্ভব নিরসনে সচেষ্ট হন। শিশুকে কোনো বিষয় বোঝানোর সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে দৃষ্টান্ত দিন। স্বতস্ফুর্তভাবে সে যাতে কোনো

বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ভুল বললেও চুপ করিয়ে না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করুন। সূক্ষ্ম গাণিতিক সমাধান করতে দিন।

শিশুকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন হলে কখনোই ভূত প্রেত ডাইনি ইত্যাদি অবাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করবেন না। বরং সে যে ব্যক্তিকে ভয় করে তার নামোল্লেখ করতে পারেন। অথবা তার পূর্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কোনো বিষয় স্মরণ করিয়ে তাকে সতর্ক করুন। যেমন ধরুন সে দুপুর বেলা রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করলে তাকে মনে করিয়ে দিতে পারেন, সে যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে খেলতে যেতে পারতো না। তার পছন্দের খাবার খেতে পারতো না। সে যদি রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করে তবে সে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন সে খেলতে যেতে পারবে না, তার পছন্দের খাবার খেতে পারবে না।

শিশুমনে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো দরকার। তবে জোরপূর্বক কোনো বিষয় তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, আবৃত্তি, হস্তশিল্প নির্মাণ সহ বহু বিকল্প তার সামনে রাখুন। সে যে কোনো এক বা একাধিক বিকল্প পছন্দ করুক। তার পছন্দমতো সাংস্কৃতিক বিষয়ে সে যাতে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয় উদ্যোগী হতে হবে আপনাকে। এবার সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জনের কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারনা দেবার চেষ্টা করা যাক।

সু-অভ্যাস গঠন করতে বা করাতে হলে সর্বপ্রথম অভ্যাসটি গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে। আজ কাল পরশু করবো, এইরূপ মনে করে গড়িমসি করা যাবে না। যদি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস করতে হয় তবে সেই দিন থেকেই তা করতে হবে। কষ্ট হলেও তা স্বীকার করতে হবে। অভ্যাস একবার দৃঢ়ভাবে রপ্ত করতে পারলে কষ্ট থাকবে না।

কোনো অভ্যাসে পুরোপুরি অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। নতুবা অভ্যাস দৃঢ়ভাবে গঠিত হবে না।

অভ্যাস গঠিত হলে অভ্যস্ত ব্যক্তি (বিশেষ করে শিশুদের) পুরস্কৃত করতে হবে। এই পুরস্কার প্রদানের অর্থ এই নয় যে তাকে কোনো বহুমুল্যবান উপহার সামগ্রী দিতে হবে। তার পছন্দমতো কোনো খাবার খাওয়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া বা তার কোনো পূর্বে অপ্রাপ্ত আব্দার মঞ্জুর করা অথবা তার কাজটির প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আমরা তাকে পুরস্কৃত করতে পারি। এই পদ্ধতি শিশুদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর তা আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

সবশেষে কু-অভ্যাস বর্জন বিষয় দু এক কথা বলবো। মনে রাখতে হবে যেকোনো অভ্যাস দৃঢ়ভাবে গঠিত হলে তা বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই কু-অভ্যাস যাতে গঠিত না হয়, সেদিকে আমাদের সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। কু অভ্যাসের খারাপ দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে অনতিবিলম্বে তা বর্জন করতে হবে। দীর্ঘসূত্রতা করা চলবে না।

কু-অভ্যাস রপ্ত হতে দেখলে শাস্তিপ্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, শাস্তি বলতে শারীরিক নির্যাতন নয়। শিশুদের পছন্দের খাবার তাকে না দেওয়া, তার পছন্দমতো খেলনা না দেওয়া, তার আব্দার মঞ্জুর না করার মতো শাস্তি তাকে দেওয়া যেতে পারে। কখনোই শিশুদের সাথে অন্য কারো তুলনা টানবেন না। বরং তার কোনো এক বা একাধিক সু-অভ্যাস বিষয় তার প্রশংসা করুন। চেষ্টা করুন যাতে তার কোনো একটি কু-অভ্যাসের স্থলে যাতে একটি সু-অভ্যাস গঠিত হয়। যেমন সে যদি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তবে ভোরবেলা তাকে সাইকেল চালানো বা প্রাতভ্রমণে অভ্যস্ত করে তুলুন।

এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জনের কৌশল অবলম্বন করতে পারলে পরবর্তী জীবনে তারা সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। আর একজন সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিই পারেন, সুন্দর একটা সমাজ গড়ে তুলতে। তাই শিশুদের সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জন করানো কেবল আপনার পারিবারিক কর্তব্য নয়, এটি আপনার সামাজিক কর্তব্যও বটে। আপনি নিজেও সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বর্জন করুন। শিশুদেরও তা করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করুন।

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

সতীদাহ প্রথা: উপমহাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়

লিখেছেন - মিস্টার অ



অনেক চেষ্টার পরেও বাঁচানো গেল না ললিতার স্বামীকে। কী এমন বয়স হয়েছিল? বড়জোর ৪০। ললিতার ১৫। না, শাঁখা সিঁদুর ভাঙা হলো না তার। টেনেহিঁচড়ে নেওয়া হলো শ্মশানে। এতদিন ললিতা শ্মশানের নাম শুনলেও ভয় পেত। তেনারা থাকেন শ্মশানে। আজও ললিতার ভয় করছে। শ্মশানকে নয়, তার স্বামীর পরিবারের লোকেদের। চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে তারা ঠেলে দেবে ললিতাকে সিঁদুরসহ। স্বামীর সাথে স্বর্গবাসী হওয়ার সুযোগ কজন পায়? ললিতার মনে হলো পালিয়ে যায়, একবার যদি পালিয়ে শ্মশানের আঁধারে হারিয়ে যাওয়া যায়, তাকে খুঁজে পাবে এরা?

মানুষের চাইতে প্রেতাত্মা বেশি ভরসার মনে হলো। না, পালাতে পারবেনা ও। শক্ত করে ধরে রাখা হয়েছে। মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করলো। কতটুকুই বা যন্ত্রণা হবে? সেবার রাঁধতে গিয়ে খালি হাতে কড়াই ধরেছিল।

সেই যন্ত্রণার কথা মনে আসতে গেলে জোর করে তাড়িয়ে দিতে চাইলো। সোজাসুজি স্বর্গ, মাঝে কোনো বাধা নেই। শান্ত হয়ে চিতায় বসলো। সবাই ভাবল কী লক্ষীমন্ত মেয়ে! আফিমের ঘোরে অনেককে তুলে দেওয়া হতো স্বামীর চিতায়।

উপরের অংশের চরিত্র কাল্পনিক। কিন্তু এরকম লাখো ললিতার আগুনে পুড়ে যাওয়ার গল্পগুলো কাল্পনিক নয়। কতটা যন্ত্রণা নিয়ে তাদের মারা যেতে হয় এই ভাবনাটা মনে উদয় হতে যতটুকু মানবতা দরকার, তা আসতে সময় লেগে গিয়েছিল অনেকখানি।

'সতী' নামটা এসেছিল দেবী সতীর থেকে। তিনি ছিলেন রাজা দক্ষের কন্যা, একইসাথে দেবাদিদেব শিবের স্ত্রী। দক্ষ মেনে নিতে পারেননি তার মেয়ে কোনো শ্মশানবাসী ভবঘুরেকে বিয়ে করবে। একদিন সতীর সামনেই শিবকে কঠোর ভাষায় দক্ষ তিরস্কার করলে স্বামীর অপমান সহ্য না করতে পেরে সতী আত্মহনন করেন। মৃত স্বামীর সাথে চিতায় ওঠার এই প্রথার নাম সতী লিখেছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকরা। আসলে একে বলা হত 'সহগমন', 'সহমরণ' বা 'সতীদাহ'। 'সতীব্রত' বলে এক প্রথা চালু ছিল, যেখানে নারী তার স্বামীকে কথা দিত, স্বামী যদি আগে গত হয়, তবে সেও সহমরণে যাবে। সতীপ্রথা পালন করা হলে নারীকে বলা হত 'সতীমাতা'। সতীদাহের কোনো আদেশ বেদে নেই বলে জানা যায়।

উইলিয়াম কেরি আর রামমোহন রায়দের মতো মানুষ না এগিয়ে এলে এই ভয়ংকর প্রথা হয়তো আরোও বহু দশক চলতো। উইলিয়াম কেরি ছিলেন একজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি, এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। ১৭৯৯ সালে তার এক নারীর সহমরণ দেখার সুযোগ হয়েছিল। এই দৃশ্যে তার আত্মা কেঁপে ওঠে। এই আচার বন্ধ না করা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন না ঠিক করেন। তিনি ও তার দুই

সহকর্মী জোশু মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড মিলে সতীদাহ বন্ধের জন্য উপর মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে তারা সতীদাহের সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করে সতীদাহ বিরোধী নিবন্ধ লিখে পাঠান।

১৮১২ সালে রামমোহন রায় সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তিনি দেখেছিলেন তার বৌদিকে জোর করে চিতায় তুলতে। শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে তিনি মৃতের বাড়ির লোকজনকে বোঝানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই কাজে আরোও অনেক অনুসারী জুটিয়ে নেওয়া কষ্টের ছিল না। এদের মাঝে দল তৈরি করে দেন, যাতে তারাও বিভিন্ন শ্মশানে যেতে পারে। তিনি তার লেখায় প্রমাণ করেন, হিন্দুশাস্ত্র সতীদাহের কথা বলে না। ১৮১৫–১৮ সালে সতীদাহ প্রথা বিকট আকার ধারণ করলে রামমোহন রায় ১৮২১ সালে একটি পুস্তিকা আর উইলিয়াম কেরি ১৮২৩ সালে একটি বই প্রকাশ করেন। কোম্পানি মূলত গোড়াদের চটাতে চাইতো না। তাই শক্তভাবে সতীদাহবিরোধী কিছু হয়নি। কলকাতাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হলেও আশেপাশের বহু এলাকাতে সতীদাহ চলতে থাকে।

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক অনেক দায়িত্ব মাথায় করে ভারতের গভর্নর হয়ে আসেন। বেন্টিঙ্ক এই প্রথা বন্ধে আর এক মুহুর্তও যেন দেরি করতে পারছিলেন না। চার্লস মেটকাফে বেন্টিঙ্ককে বলেন, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সতীদাহ বন্ধ করলে বিদ্রোহীরা বিপ্লবের সুযোগ খুঁজতে পারে। বেন্টিঙ্কের কাছে বিপ্লবের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বিধবাদের জীবন।

৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ সাল। লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন জারি করে সতীদাহ নিষিদ্ধ ও সতীদাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ফৌজদারি আদালতে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এর অনুবাদের

দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়াম কেরিকে। ধার্মিক কেরি সেদিন তার চার্চ বাদ দিয়েছিলেন অনুবাদ করার জন্য। তার মনে হয়েছিল, অনুবাদ করার দেরির জন্য একজন বিধবার প্রাণ গেলেও সেটা তার দায়। ১৮৩০ সালের মাঝে বোম্বে ও মাদ্রাজেও আইনের হাত প্রসারিত হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কয়েক হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী পিটিশন করেন এই আইনের বিরুদ্ধে। তাদের মতে, ইংরেজ সরকার তাদের ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলাবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়ালে রামমোহন রায় উল্টো আইনের পক্ষে পিটিশন করেন। প্রিভি কাউন্সিল আইনের পক্ষে মত দেয়।

তখনও ভারতের সব অঞ্চল সতীদাহ বিরোধী আইন করেনি। ভারতে পুরোপুরি সতীদাহ আইন করে বন্ধ করতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত লেগে যায়।

মেবার অনেক দিন পর্যন্ত প্রথা টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু জনগণের মাঝে সতীদাহ বিরোধী সচেতনতা তখন তুঙ্গে। মহারাণা স্বরূপ সিং মারা গেলে তার কোনো স্ত্রীই তার সাথে সহমরণে যেতে রাজি হয়নি।

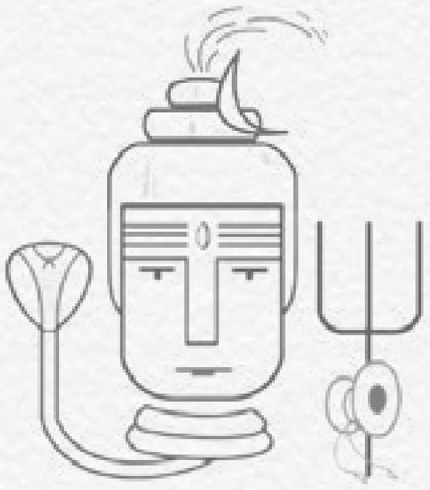
প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে আইন জারি করে সতীদাহ বন্ধ করা যায়নি। লুকিয়ে সতীদাহ চলছিলই। প্রথা যখন সামাজিক নিন্দার শিকার হতে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে ভারত থেকে সতীদাহের মতো শতবর্ষের কুপ্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয়।

করতেও বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মের পুরাণে বহু চরিত্র আছেন যারা স্বামীর মৃত্যুর পর বহাল তবিয়তে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সহমরণ কোনো নতুন বিষয় ছিল না, এমনও নয় যে ভারতে প্রথম এমন প্রথা চালু হয়েছিল, কিংবা ভারতকে দিয়েই শেষ হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের সহমরণের বর্ণনাও পাওয়া গেছে। তাহলে কিভাবে সতীদাহ এত প্রচলিত হয়ে পড়লো?

ছোটগল্প

সবই বিভ্রাট

লিখেছেন - চম্পা রায়



দিনটা ছিল শিবরাত্রির আগের দিন। বিকেলে ঘরে বসে পড়ছিলাম। পরীক্ষার একমাস আগে সকাল বিকেল ভাবলে চলেনা। গাঁক-গাঁক করে মুখস্থ করে যেতে হবে যাতে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত কোনো রকমে মনে থাকে। অনেকটা পুরস্কারের লোভে খাওয়ার কম্পিটিশনের মতো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাকে মুখে দিয়ে গুঁজে খাও। কম্পিটিশন শেষে বমি করে বের করে দাও। পরীক্ষার আগের পড়াটাও তেমনি। পরীক্ষার হলে যাবার আগে পর্যন্ত, মাথায় মনে সিলেবাস ঠুসে নাও তারপর খাতায় বমি করে ক্লিয়ার হয়ে যাও। তাছাড়া বাবা বলেছে ফেল করলেই বিয়ে দিয়ে দেবে। এটা একটা বড় চাপ। পড়াশোনা খুব একটা ভালো লাগে না। বড্ড বোরিং ব্যাপার স্যাপার। তাই বলে এখনই বিয়েও করতে চাই না। কম নম্বর পেয়েওতো দিব্যি ঘুরে ফিরে হেসে খেলে বাঁচা যায়। বাবাটা যে কেন এসব কথা বোঝে না। এ দুঃখের কথা কাকে আর বলব! নিজের বাবা ই বোঝে না,অন্যে আর কি বুঝবে!

মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে সেদিন পড়ছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে। দুটো নোট মুখস্থ করে তিন নম্বরটা ধরেছি, হঠাৎ আমার বান্ধবী রণিতা দুমদাম শব্দ করে ঘরে এসে হাজির। "বাব্বাহ্ এখনও পড়ছিস? তুইতো ফার্স্ট ক্লাস পাবিই পাবি। আমিতো পড়িই না ঠিক ফেল করব।"

মনে মনে ভাবলাম তোর মুখের কথাটা যেন সত্যিই হয়, কিন্তু মুখে বললাম "না রে! অনার্সে ফার্স্ট ক্লাসের কথা বলিস না। কোনো রকমে টেনে টুনে পাশ করতে পারব কিনা কে জানে!"

রণিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "নে নে আর মিথ্যে বলতে হবে না আমায়। চোখেতো সবই দেখতে পাই।"

জীবনে বন্ধু থাকার এই একটা সমস্যা পড়াশোনাটাও চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে করতে হয়। আবার পরীক্ষার দিন টেনশন না হলেও চোখে মুখে ভাঁজ ফেলে টেনশনের ভান করে থাকতে হয়। না হলেই আড় চোখে বলবে, "বা বা, ও কত পড়ে! তবুও ঢং করে বলে পড়তে ভালোবাসে না।"

মনের বিরক্তিকে মনেই সমাধি দিয়ে বললাম, "এসে ভালোই করেছিস। সকাল থেকে তোর কথাই মনে পড়ছিল। তা তুই ক'টা নোট মুখস্থ করেছিস?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে রণিতা বলল, "আমি কি আর তোর মতো বই গুঁজে থাকতে পারি!"

আমি একটু ইতস্তত হয়ে বললাম, "না রে আমি এই বসলাম পড়তে, একটা নোটও মুখস্থ হয়নি।কি যে হবে!"

রণিতা এবার আমাকে ঠেলে বলল, "আর পড়তে হবে না। বাজারে যাব, চল।"

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "আমার শরীরটা ভালো না,

যেতে পারবনারে।"

"যাবি না মানে! কাল শিবরাত্রি পালন করবিনা?"

"এইরে! কাল শিবরাত্রি? একদম মনে নেই।" আর তাছাড়া কি'ই বা হবে শিবের পূজো করে।

রণিতা সদ্য প্রেমে পড়েছে তাই বয়ফ্রেন্ডের জন্য ব্রত করবে। ভক্তি ভরে শিব পূজো করলে নাকি ভালোবাসার পুরুষটি ভালো থাকে। কিন্তু আমি কী কারণে শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবো!

যদিও একদম ছোট বেলায় মানে প্রাইমারিতে পড়াকালীন পুজো পাঠে আমার খুব মন ছিল মানে খুব ভক্তিমতি ছিলাম আরকি। পাড়ার সব মেয়েরাই তখন শিবরাত্রি পালন করত। ওদের সাথে আমিও করতাম। আগের দিন একবেলা খেয়ে সংযমে থেকে হাত পায়ের নখ কেটে শুদ্ধ হতাম। পুজোর দিন সারাদিন উপোস। সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করে ঘটি মাথায় করে নিয়ে আসতাম জল। সারা রাত জেগে প্রহরে প্রহরে ঢেলেছি জল।

প্রাইমারি পেরিয়ে হাইস্কুল যাবার পর আর করা হয়নি।এইসময় করে তখন ফাইনাল পরীক্ষা হতো। দীর্ঘকাল এসব থেকে দূরে থাকায় এ ব্যাপারে আর ইচ্ছেও হয়নি।

রণিতা বলল, "এইজন্যই তোকে কেউ পাত্তা দেয় না, এই জীবনে তুই আর বয়ফ্রেন্ড পাবি না। তোর জীবনটা প্রেমলেসই থেকে যাবে।"

ওর কথা শুনে ভেতরের নারীবাদী সত্ত্বা জেগে উঠলো, বিস্ফোরিত চোখে বললাম, "পাত্তা না দেয় না দিক, প্রেম ছাড়া কি একজন নারী মরে যাবে নাকি?"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার হাল ধরল রণিতা, বলল "দেখ ফার্স্ট ইয়ারের সব মেয়ের বয়ফ্রেন্ড আছে শুধু তোরই নেই।"

একথাটা শুনে আমার বুকটা হু-হু করে উঠলো। ও আবার বলল "বয়ফ্রেন্ডরা ভালো ভালো গিফ্ট দেয়।" বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলল এই ঘড়িটা দিয়েছে, খুব কেয়ারিং রে ও।" আরো অনেক কথা বলেছে, যেহেতু কবি বলেছেন "সব কথা সব জায়গায় বলতে নেই" তাই আর বলছি না সেসব কথা।

বয়ফ্রেন্ড থাকার উপকারিতা আমি বুঝে ফেললাম। যেকোনো উপায়ে একটা বয়ফ্রেন্ড জোটাতেই হবে। তাতে যদি দুদিন উপোস করতে হয়, করব। ৫ কিলোমিটার খালি পায়ে হাঁটতে হয়, হাঁটবো। গরম বালির উপর হেঁটে মাথায় করে জলভরা কলসি নিয়ে আসতে হয়, আসব।

পরদিন ভোরে উঠে স্নান করে আকন্দ ফুল, ধুতুরা ফুল বেল পাতা, দূর্বা, গঙ্গা জল সব রেডি করেছি। রণিতা ৮টার সময় লাল পাড়ের শাড়ি পরে সেজেগুজে হাজির। আমার পূজোর সামগ্রী চেক করে বলল, "ডাবের জল নিসনি কেন?"

"এখন গাছ থেকে ডাব পাড়ব কি করে? মা'তো বকবে"।

"ডাবের জল না দিলে তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।"

মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ করতেই হবে, একমাসের মধ্যে বয়ফ্রেন্ড জোটাতেই হবে। অগত্যা বাবার কাছে গিয়ে একটু মনখারাপের অ্যাক্টিং করলাম। বাবা ডাব পেড়ে ডাব ছাড়িয়ে জলটা ঘটিতে ভরে দিলো। আহা! ডাবের জল আমার ভীষন প্রিয়। মনে হচ্ছিল ঘটি থেকে জলটা একটানে খেয়েই ফেলি। ছিঃ ছিঃ এ আমি কি ভাবছি! হে ভোলানাথ! পাপ নিওনা। রণিতার থেকে ভালো বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে দিও প্লিজ।

কাঁকড় রাস্তার উপর দিয়ে খালি পায়ে যেতে যেতে বললাম "হ্যাঁ রে কাপড়ের জুতো পরলে তো পাপ হতো না।"

"যদি করো কষ্ট তবেই পাবে কেষ্ট বুঝেছো!"

কিছু বললাম না। কেষ্ট তো পেতেই হবে, না হলে ক্লাসে মান থাকছে না। সব মেয়েরা নাকি আমার পেছনে আলোচনা করে বয়ফ্রেন্ড নেই বলে! দাঁড়া! এমন ভক্তি দিয়ে এমন পূজো করব একেবারে শাহীদ কাপুরের মতো একটা বয়ফ্রেন্ড জুটবে। তখন তোদের সবার হাসি ফুস হয়ে যাবে।

রোদের মধ্যে ঘেমে নেয়ে পাঁচ কিলোমিটার কাঁকড় রাস্তায় হেঁটে পৌঁছালাম মহেশ্বর বাবার আশ্রমে। দামোদর নদের পাড়ে একটা বড় বট গাছের নীচে মহেশ্বর বাবার আশ্রম। একদিকে ছোট একটা কুঁড়ে ঘর আছে সেখানে কয়েক জন জটাধারী সাধু থাকে। অন্য দিকে একটা ছোট মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গ আছে। এখানে অনেক দূর দূর থেকে মেয়ে বৌ'রা জল ঢালতে আসে। তাই লম্বা লাইন পড়েছে।

আমরা পুজোর সব জিনিসপত্র গাছ তলায় রেখে একটা ঘটি নিয়ে নদীতে জল আনতে চললাম। এপাড়ে অনেক বালি পড়ায় শুধুমাত্র বর্ষাকালেই জল থাকে। অন্যান্য সময়ে বালির উপর দিয়ে হাফ কিলোমিটার মতো হেঁটে গেলে জল পাওয়া যায়। না খেয়ে রোদে গরমে বালির উপর হাফ কিলোমিটার মনে হচ্ছিল পাঁচ কিলোমিটার। যত কষ্টই হোক! শিব ঠাকুরকে আজকে সন্তুষ্ট করেই ছাড়ব। এত কষ্ট করছি সেটা ভোলানাথ ঠিকই দেখছেন। শাহীদ কাপুরের মতো বয়ফ্রেন্ডের ব্যবস্থা ঠিকই করে দেবেন।

বিকেলে বাড়ি ফিরলাম। সন্ধ্যা থেকে মাথা ব্যাথা। রাত থেকে ধুম জ্বর। জ্বরের ঘোরে দেখছিলাম শাহীদ কাপুর পাশে বসে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। সারা রাত আমিও জেগে শাহীদ কাপুরও জেগে। সকালে জ্বর একটু কমেছে

কিন্তু ঘোরটা রয়ে গেছে। ঘোরেই বললাম, "আমার শাহীদ কই? আমার শাহীদ কই?" কাল সারাদিন উপোস থেকে মেয়েটার পেটও গরম হয়ে গেছে।" একি! শাহীদ কাপুরের গলাটা অন্যরকম লাগছে কেন? অনেকটা মায়ের গলার মতো।

তিন দিন পর রাতে ঘুমাচ্ছি ফোন বেজে উঠল। এত রাতে ফোন বিরক্তিকর। তবুও ঘুম চোখে দেখলাম রণিতার ফোন। রিসিভ করতেই হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে জানালো ওর ব্রেকআপ হয়েছে। ছেলেটা নাকি খুব খারাপ ছেলে। ওর কোনোদিন ভালো হবে না, সুখে থাকবে না। আরও কি'সব বলছিল। ঘুমের ঘোরে ছিলাম বলে মনে নেই।

আর আমি? এখনও সিঙ্গেল থাকার উপকারিতা লিখে যাচ্ছি।

অনু গল্প

এক জাদুকর

লিখেছেন - মোশাররফ হোসেন মুসা



রেল স্টেশনের পাশে ফাঁকা জায়গাটি প্রায় দিনই কবিরাজ, সাপুড়ে, ভ্রাম্যমান শিল্পী কিংবা হকারদের দখলে থাকে। সেদিন এক জাদুকর জাদু দেখানোর আয়োজন শুরু করেন। তার পরনে হলুদ রঙের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, লাল রঙের লুঙি আর মাথায় তিন রঙের পাগড়ি। তিনি প্রথমে আকাশের দিকে লাঠি উচিয়ে বিকট চিৎকার দিয়ে পাগলি মাতাকে আহ্বান করে মাটিতে নেমে আসতে। সে সঙ্গে মুখে শিস দিতে দিতে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একটি হাড় দিয়ে (তার ভাষায় রহু চণ্ডালের হাড়) বৃত্ত একে দেয়। উৎসুক লোকজন বৃত্তের বাইরে দাড়িয়ে তার জাদু দেখতে থাকে।

আমি এখন যেটা দেখাবো সেটাকে কী বলে? দর্শনার্থীর মধ্য থেকে কয়েকজন বলে উঠে জাদু জাদু! তিনি বলেন

– হাঁ, জাদু জাদু। আমি জাদুকর। জাদু দেখানোই আমার পেশা। শ্মশ্রুমণ্ডিত এক যুবক বলে জাদু দেখানো কুফরি কাজ। জাদুকর বলেন – আপনি কুফরি বলছেন, কারণ আমি প্রথমেই বলেছি আমি জাদুকর। আর যদি সেটা না বলে মাথায় জট পাকিয়ে ওই বটবৃক্ষের নিচে বসে পড়তাম, তাহলে হয়ে যেতাম পীর। সৃষ্টি হত মাজার। কামাই হতো কোটি কোটি টাকা। শ্মশানে বসলে হতাম তান্ত্রিক। কিছু অন্ধ অনুসারী যোগাড় করতে পারলে হতাম সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা আওলিয়াও। এমনকি হতে পারতাম একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তকও। মনে রাখবেন গৌতম বুদ্ধ ছাড়া সকল ধর্মপ্রবর্তককেই পিভিসি দেখাতে হয়েছে। পিভিসি'র এতো ক্ষমতা, তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অবতার বানিয়ে পিভিসি'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কথায় বলে– সত্য বলিবে, না খেয়ে মরিবে, মিথ্যা বলিবে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে আসিবে।'

তিনি বৃত্তের মধ্যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে আবার বলা শুরু করেন – আমি তাদের অলৌকিক ঘটনার ও অলৌকিক ক্ষমতার তিনটি গোপন সুত্র ফাঁস করে দিবো। তাহলো পিভিসি PVC মানে– passing, vanishing, changing।'

তিনি মাঝে মধ্যে বলতে থাকেন–'জাদু খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ স্থান ত্যাগ করবেন না। যদি যান, রাস্তায় রক্ত বমি হয়ে মারা যাবেন, তখন আমাকে দায়ী করতে পারবেন না।'

মানুষ সম্মোহিত হয়ে তার জাদু দেখতে থাকে। তিনি ছাত্র টাইপের একটি ছেলের কাছে গিয়ে একটি ১০ টাকার নোট চান। সেসঙ্গে বলেন – আপনার দশ টাকাকে ১০০ টাকা বানিয়ে দিবো। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকা বের করে দেয়। জাদুকর দশ টাকার নোটটি হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ডান হাতে হাড় দিয়ে কয়েকবার ঘুরিয়ে নেন। এরপর সকলের অনুমতি নিয়ে হাতের মুঠোটি খুলেন। কী আশ্চর্য!

দশ টাকার নোটটি ১০০ টাকার নোট হয়ে গেছে। এরপর তিনি ১০০ টাকার নোটটি যুবকটির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন - দেখুন আপনি ১০০ টাকা পেলেন কি না! যুবকটি তার পকেট থেকে টাকা বের করে দেখে ১০ টাকার নোট।

এরপর তিনি বেছে নেন একজন দিনমজুরকে। লোকটি হয়ত সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরছে। মাথায় মাথালটি সারাদিনের পরিশ্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জাদুকর বলা শুরু করেন - আমি একটি ছেলেকে মেয়ে আর একটি মেয়েকে পুরুষে রূপান্তরিত করতে পারি। এই বলে তিনি দিনমজুর লোকটির অন্ডকোষ বরাবর তার হাড়টি ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে ফুঁ দেন। এবার দিনমজুরকে বলেন - এবার দেখুন আপনার অস্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না! লোকটি হাত দিয়ে দেখে তার পুরুষাঙ্গ সহ অন্ডকোষ গায়েব হয়ে গেছে। লোকটি তৎক্ষনাৎ ঢলে পড়ে যেতে থাকে। জাদুকর দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে এবং পাশের কয়েকজনকে তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ সে যদি শুয়ে পড়ে তাহলে আর কোনোদিন তার অস্ত্রপাতি ফেরৎ পাবে না। এরপর তিনি আগের মতো হাড় ঘুরিয়ে কয়েকবার ফুঁ দেন এবং দিনমজুরকে জিজ্ঞেস করেন- দেখুন এবার আপনার জিনিসপত্র ফেরৎ এসেছে কি না! দিনমজুর হাত দিয়ে ঠিকঠাক আছে দেখে হাসতে থাকে। এরপর জাদুকর একজন আধা ভদ্রলোক টাইপের একটি লোককে বেছে নেন। তারপর তিনি বলেন- দেখুন তো আপনার মানিব্যাগটি ঠিক আছে কি না! লোকটি পিছনে হাত দিয়ে তো অবাক! মানি ব্যাগ নেই! তার কঠিন মুখটি মুহূর্তেই কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। জাদুকর কঠিন স্বরে বলে উঠলেন- এক মিনিট সময় দিলাম। যে পকেটমার মানি ব্যাগ নিয়েছেন ফেরৎ দেন। তা নাহলে আমি পকেট হাতাতে বাধ্য হবো। দর্শকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। জাদুকর বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে আর এক দুই তিন চার গুনতে থাকেন।

হঠাৎ এক অল্প বয়সী ছাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি এক মিনিট সময় দিয়েছিলাম কিন্তু শুনেননি। এই বলে তার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে এনে ভদ্রলোককে ফেরৎ দেয়। তারপর জাদুকর তার মাথার পাগড়িটা খুলে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। দর্শকরা কেউ কেউ এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে তার পাগড়ির মধ্যে দিতে থাকে। অবশেষে তিনি টাকা গুণে দেখেন মোট ২৮০ টাকা হয়েছে। জাদুকর হাসতে হাসতে বলতে থাকে –আমি তো আগেই বলেছি সত্য বলিবে, না খেয়ে মরিবে, মিথ্যা বলিবে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে আসিবে।' এই বলে তিনি বাক্সপেটরা গুছিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

লেখক: গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষক। পাবনা, বাংলাদেশ।

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার। শাস্ত্রে যাঁদের অন্ধবিশ্বাস তাঁরা কখনও এই শিক্ষা দিতে পারবে না।...লজ্জায় আমার মাথা নত করে বলতে হচ্ছে যে, ভারতের ধর্মান্ধ পণ্ডিতেরা মনে করেন,প্রাচীন ঋষিরা যে–শাস্ত্র রচনা করেছেন, তা একেবারে অভ্রান্ত। পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান তাঁদের চরিত্রের বিরোধী।"

–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ছোটগল্প

ফোকাস

লিখেছেন - সুমন কর্মকার



ঘড়ির কাঁটায় রাত দুটো। ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসছে ঝিলামের। কিন্তু না, ঘুমোলে তো চলবে না। আর মাত্র তিনটে মাস পরেই WBCS মেইন এর আগেও দুবার প্রিলি ক্রাক করেছিল ঝিলাম। কিন্তু মেইনে এ হয়নি। আগামী বছর সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে যাবে, আবার স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে হবে, তাই এবারেই দিতে হবে মরণকামড়। এটা তো নিছক একটা পরীক্ষা নয়, এটা ঝিলামের এতো বছরের আপোষহীন লড়াইয়ের একটা সার্বিক মূল্যায়ন। এই পরীক্ষার রেজাল্টটার মাধ্যমেই ঝিলাম বেশ কয়েকজন মানুষের ভাবনার ওপর কষাঘাত করতে চায়। তালিকায় নাম অনেককটা। মাঝে-মাঝে সেই তালিকাটা মনে মনে ঝালিয়ে নেয় ঝিলাম। বলতে গেলে এরাই ওর ইন্সপিরেশন। চোখ বন্ধ করতে প্রথমেই ভেসে ওঠে রক্তিমের মুখটা। একটা ভালো সম্পর্ক ছিল ওদের। বন্ধুত্ব ছিল, প্রেম ছিল, ভালোবাসা ছিল প্রচুর। তবে এতো ভালোর মধ্যেও রক্তিমের খালি একটাই অভিযোগ ছিল, ঝিলাম নাকি ওকে সময় দেয় না।

সপ্তাহে পাঁচদিন দশটা পাঁচটা অফিস করে, ট্রেনে তিন

তিন ছয় ঘন্টা কাটিয়ে, বাড়ি ফিরে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়ে একজন যতখানি সময় দিতে পারে, ঝিলাম হয়তো তার চাইতে বেশিই দিতো কিন্তু রক্তিমের সেটা কখনোই পর্যাপ্ত মনে হয়নি। অবধারিতভাবে বাড়তে থাকে দূরত্ব। কমতে কমতে কথা বলা একটা সময়ে প্রায় থেমেই যায়। তারপর আসে সেই দিন, ঝগড়ার মধ্যে ঝিলাম বলে ফেলে, "দ্যাখ রক্তিম, তোর আর আমার ফোকাস আলাদা। যদি কটা দিন সময় দিতে নাই পারবি, অন্য কাওকে খুঁজে নে। আমি বাধা দেবনা।" রক্তিম চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ থাকে। তারপর একটা সময়ে কলটা কেটে যায়। দেখতে দেখতে তিনটে মাস পেরিয়ে গেলো। এই কমাসে রক্তিমের কথা মনে পড়েনি এরকম একটা দিনও ঝিলামের পেরোয়নি। ঝিলাম বহুবার ভেবেছে সেদিন কথাগুলো ওরমভাবে বলা ওর উচিৎ হয়নি। অপেক্ষা করেছে মোবাইল স্ক্রিনে রক্তিমের নাম ভেসে ওঠার। নাহ্, কল তো দূরে থাক, একটা মেসেজও আসেনি। আজ এতোদিন পরে রক্তিমের কথা মনে পড়াতে ঝিলামের মনে হলো একবার কল করলে কেমন হয়? ওদের কোনো অফিসিয়াল ব্রেক আপ হয়নি। কল করাই যায়। মোবাইলটা হাতে তুলে নিলো ঝিলাম। স্ক্রিনটা অন করতেই চোখে পড়লো হোয়াটসঅ্যাপ নোটিফিকেশন। বৃষ্টির মেসেজ, "কাল অফিস যাচ্ছ?" বৃষ্টি ওর অফিসের কলিগ, কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতাটুকু বাদ দিলে ওর সঙ্গে ঝিলামের সম্পর্ক ভালোই। আরও ভালো হয়েছে যখন রক্তিমের সাথে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অফিসে ওর থমথমে মুখ দেখে প্রথমবার বৃষ্টি ওকে 'কি হয়েছে' জিজ্ঞেস করেছিল। বাকি সবাই যখন নিজের কাজে প্রচন্ড ব্যস্ত, কারও দিকে তাকানোর সময় নেই, তখন বৃষ্টির ওই সামান্য কেয়ারটুকুই ঝিলামকে ছুঁয়ে যায়। ঝিলাম খুব বেশি মানুষের সাথে মিশতে পারেনা। তাই কথা বলার লোক বলতে কেবল রক্তিমই ছিল। সেদিন রক্তিমের সব কথা বৃষ্টিকে বলে ফেলে ও। বৃষ্টির কাছে যতখানি সহমর্মিতা

ও এক্সপেক্ট করেছিল, তার চাইতে ঢের বেশি বৃষ্টি ওকে দেয়। সেদিন অফিস ছুটির পর ওরা দুজন রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। সেই বৃষ্টিও ঝিলামকে প্রায়ই বোঝায়, "তুমি কেন এতো চাপ নিচ্ছ? পিএসসি অফিসার হওয়ার সুযোগ কতজন পায়? কি দরকার আবার এতো খাটা খাটনি করে বিসিএস হওয়ার?" ঝিলাম কিছু বলে না। এর উত্তর দিতে দিতে আজ ও ক্লান্ত। ও কি করে সবাইকে বোঝাবে, স্বপ্নকে ঝেড়ে ফেলা এতো সহজ নয়। অন্তত ওর কাছে তো নয়ই। না, স্বপ্নের সাথে আপোষ ও করবে না। বৃষ্টিকে আর রিপ্লাই করলো না ঝিলাম। তাছাড়া এতো রাতে মেসেজ করলে, ও দেখবেও না। হয়তো বরকে জড়িয়ে ধরে সুখনিদ্রায় মগ্ন। রক্তিমকেও কল দেওয়া হলো না। কি লাভ সে বেচারিকে বিরক্ত করে? লড়াইটা যখন নিজের, লড়তেও হবে নিজেকেই। লড়তে হবে এবং জিততে হবে। জিতে দেখিয়ে দিতে হবে সবাইকে, হ্যাঁ সব্বাইকে, মা কেও। মায়ের কথা মনে পড়তেই ওর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বেচারি আজকাল বড় বেশি টেন্সড থাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ঝিলামকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মা। ওকে কক্ষণো সাংসারিক কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে দেয়নি। খালি বলেছে, "তুই তোর পড়াটা কর। তোকে পারতেই হবে।" ঝিলামের মুখে চাকরি পাওয়ার খবরটা শুনে মায়ের ভিজে ভিজে চোখগুলোর কথা আমৃত্যু ও ভুলতে পারবে না। সেই মা'ও আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শির কথা শুনে শুনে আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। এই তো গত সপ্তাহেই ঝিলামকে বোঝাচ্ছিল, "দ্যাখ মা, একটা বয়সে এসে মেয়েদের বিয়ে করে নেওয়াটাই ভালো। তাতে সবটাই ঠিক থাকে।" ঝিলাম সেদিন মাকেও কিছু বলতে পারেনি। খালি সেই আলোচনায় শরিক হতে পারেনি। উঠে এসে নিজের রুমের দরজা দিয়ে অঙ্ক বই খুলে বসেছিল। আজকাল ওর এসব গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। ও জানেনা লোকজন স্বপ্নকে হেলায় হারিয়ে ফেলে কিভাবে? ওর স্বপ্নকে ও কক্ষণো

ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি, পারবেও না। আশেপাশের সবকটা প্রিয় মানুষ ভুল বুঝে দূরে চলে গেলেও না। ঝিলামকে ওর স্বপ্ন একদিন ছুঁতেই হবে। আর তার জন্য চাই ফোকাস। হ্যাঁ, ফোকাস ঝিলাম, ফোকাস, ফোকাস। চোখদুটো বার দুয়েক কচলে নিয়ে, ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশনে ডুব দিলো ঝিলাম। ওর জীবনে রেভোলিউশনের সন্ধিক্ষণ আসাটা এখন খালি সময়ের অপেক্ষা।

ছোটগল্প

জাইলা কন্যা

লিখেছেন - সুদামকৃষ্ণ মন্ডল



বাপটা চলে যাবার পর সংসার অচল হওয়ার উপক্রম। সঞ্চয়ও কিছুই নেই। ঘরে বাইরে থাকার মধ্যে খানকতক ঝাউ গাছ। কে নেবে – ক' টাকা দাম। শিরীষ গাছটা মোটা বলে তক্তা বেরোবে বেশ তাই বিক্রির অপেক্ষায়। খদ্দের কে'বা আছে। অধর মরে গেল হঠাৎ বুকের ব্যথায়। সে-ই তো বলেছিল, নাও উগ্গা বানাম ডঁর মিক্যা। কেঅরে নঅ দিউম। কিন্তু বাপের কথায় এখন তো মান্যতা দেওয়া যায় না। মা মুসড়ে থাকে। পুত্র নেই – তিন তিনটে কন্যা। বড় হলেই বিয়ে দিতে হবে। আত্মীয় – বন্ধু – বান্ধব তেমন কেউ নেই যে সেই দায়ভার বহন করবে। বড়টার বয়স চোদ্দ পরেরটার বয়স বারো ছোটটার বয়স নয়। শিশিরে কি ফুল ফুটবে? মায়ের বিষাদ ভরা সংসারে কে দেবে মনোবল। মেয়ে হলো পরের ঘরের শোভা। ওরা গেলে –

দুটো বেঁউতি জাল। একটা নৌকা। বড় মেয়ে বাপের সাথে থাকত নৌকায়। সে দাঁড় টানে, হাল ধরে সাঁতরে জাল নৌকার কাজও করে। তবে হ্যাঁ বাবা বেশিরভাগ সময় মেয়েকে নৌকায় রেখে সেই সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। উমার নৌকা জালের কাজ যথেষ্ট শেখা হয়েছে। উমা- উষা- উর্মি তিন বোনের বাবার মৃত্যুর পর পরস্পরের হৃদ্যতা বেড়েছে। শোক-সন্তপ্ত মাকে তিনজনেই সান্ত্বনা দেয়, আমরা তো আছি এই ভাব দেখায়। কিন্তু দ্রৌপদীর মন স্থির নেই। কারন সেও তো জানে বাংলাদেশে থাকাকালীন মা বাবার করুণ অবস্থা। বাবা বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে রাঙ্গাবালী দ্বীপেতে শীত মরশুমে শুকনো মাছের ব্যবসায় নৌকায় ছিল। তখন নৌকায় কোনও মেশিন ছিল না। দাঁড় টানতে টানতে হঠাৎ বুকের ব্যথায় মারা যায়। আর মায়ের অবস্থা সামাল দেবার জন্য তাদের দুই বোনের কোনো করার ছিল না। যেহেতু বিবাহিত। মায়ের ভালো-মন্দ দেখতে এপার বাংলা থেকে কারোরই দেখার সম্ভব ছিল না। ওপার বাংলার ধর্মান্ধরা সব কেড়েকুড়ে পথে বসিয়েছে। বেঁচে আছে কিনা তাও জানা নেই। মরে গেলে তো কথা হয় না। নিখোঁজ। মনের কোণে সেই ঘা না শুকোতে আর এক ঘা ফোঁড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত লাগে।

দ্রৌপদী বলল, ওডি নাঅ জাল বেচিয়ারে কঁঅর্তে কি করিবি ? যা সম্পদ তুয়াই চা সাঁই ইন লইয়ারে বাঁচন পরিব।

- ওমা কোনওমিক্যা নঅ যাউম। আঁই জাল ধরিত্যে পাইর্জুম। মনৎ রাখিবি আঁরা জাইল্যা জাত। উমা বলল। তার কথার মধ্যে তার দৃঢ়তা ছিল।

ভোল বদলানো যাদের নিজস্ব গুণ আর জন্মায়ও মেয়ে মানুষ হয়ে আঠারো আনা পুরুষ মানুষ পরিবারে থেকেও কি লাভ। মুহূর্তে আজব রূপ ধরতে পিছপা হয় না। মাকে বলে মিস্ত্রি এনে নৌকার বাঁক বরাস ঠিক করে আলকাতরা দিয়ে উপযোগী করে তুলল। আর জালের কাজও করে

ছেঁড়া সারাই করে নতুন কাছি -লগি -নোঙর - সেঁউতি নিয়ে মা -মেয়ে আর মেজো বোন উষাকে নিয়ে মা গঙ্গার নাম করে ময়না পাড়ার খালে মাছ ধরতে গেল। প্রথমবার দক্ষ পরিচিত দু'জন পুরুষ মানুষ নিয়ে ঝাউর গোঁজ পুঁততে গেল। তারপরে আর কাউকে লাগায়নি। মেয়ে মানুষের শক্তি কম। কিন্তু কৌশল রপ্ত আছে বলে সদাসতর্ক হয়ে জোয়ার ভাঁটায় জালের ছলা উঠা নামা করে। ওদের দেখে পাশে আরও যারা মাছ ধরে তারা হাসে। আফসোস করে। আক্ষেপ করে। দ্রৌপদী এমনিতে শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল মনও ভেঙ্গে চুরে কাঁচের টুকরো হয়েছিল। ওসব কাজে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ওসব কাজে অন্যমনস্ক হলে বিপদ হতেই পারে কারণ জলের শক্তি অসীম। এই বিষয়ে উমা বাপের থেকে রপ্ত করেছে।

মেয়ে মানুষ, লোনা জলে পড়ে পড়ে ফর্সা দুধে আলতা উমা কালচে হয়ে যাচ্ছে। যে উমাকে দেখে সবাই শ্রী-সুন্দরের আকর্ষণে তাকিয়ে থাকত এখন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। মাতৃচিহ্নগুলো বেশ প্রকাশ্য ওড়নার মারপ্যাঁচে কোমর অবধি চুড়িদারের উপরে জড়িয়ে রাখে। মায়ের শাড়িও মার দেখাদেখি ও পরামর্শে জড়িয়ে নেয়। কিন্তু ছলা তুলতে গিয়ে মা স্লিপ করে উল্টে পড়ে গেল নদীতে। দ্রৌপদী সাঁতার জানত। কিন্তু স্রোতের টান ছিল। ভেসে যাচ্ছে সাঁতরে আসতে পারছে না। কাপড় পায়ে জড়িয়ে যাওয়াতে কষ্ট হচ্ছিল --- উমা ঝাঁপ দিয়ে উষাকে বলল, একখান ডঁর রশি জুরে ম্যালা মারিতি। জুরে -- জুরে মার। অবশেষে সে তার মাকে এক হাতে ধরে সাঁতরে রশি ধরিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। মায়ের কাপড় খুলে দিতে বলল। ভেসে গেল কাপড়। জল অপসারণ করে এক সময় মাকে নিয়ে নৌকার ধারে এসে স্বস্তি পেল। দ্রৌপদীর লোনা জল অল্প নাকে মুখে জলশক্তির ইচ্ছেতে কাহিল করলেও উমার মনের জোরে কিছুই হলো না। উমা বলল ; মা রে তুই

আর নঅ আসিবি।

– তয় ক্যান কইরতাম কঅ সাঁই। তখনও বুক কাঁপছে।

-আই -- মাছ ত গিঐ। যা আছে তুয়াই দে। বিপদ ভুলে মনের জোরে আবারও তারা ছলা তুলতে গেল। মাছ পড়েছে। বোমলা /নিহারু -চিংড়ি -আমুদি - পমপ্লেট দু-চারটা -কাঁকড়া তোপসে ইত্যাদি মিলে আশি -পঁচাশি কেজি প্রায়। ঝুড়িতে তুলে বাছবুছ করে সাজিয়ে নিল। মা যেতে পারবে না। উমার বুকের ওড়না জড়িয়ে নৌকায় বসে। সে নিজেই ভ্যান ঠিক করে নিয়ে আসল স্থানীয় অকশান মার্কেটে। বিক্রি করে মায়ের কাপড়ের জন্য সে বাড়িতে আসল।

নৌকায় যাবার সময় সাথে নিল অম্লানকে, যে সর্বক্ষণ তার পিছু নেয়। সে পড়ে হাই স্কুলে। একই সঙ্গে পড়াশোনা করত। শৈশবে চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়ার পর বাবা তাকে নিয়ে যায়। আর পড়াশোনা হয়নি। অম্লানও এখন আর পড়ার জন্য উৎসাহী নয়। অসৎ সঙ্গে পড়ে ডানপিটে হয়েছে। নামমাত্র নবম শ্রেণীতে পড়ে। বাবা মাকে না বলে নিজেই উমার হাত ধরে নৌকার কাছে গেল।

-তুই ইবারে আইন্যস ওডি? কিয়া?

-হইঅ। তুই লামিয়ারে যঅগৈ। ঘরৎ যাইয়ারে আঁরার লাই ভাত আনিবি।

এভাবে দু'বোনে আর অম্লান নৌকায় থাকে। পুরুষ মানুষ থাকলে যদিও কিশোর ওদের সাহসের অভাব নেই। রাত্রিতে নৌকার ছাউনিতে ঘুমায়। খড় আর আগুন পাশাপাশি থাকলে আগুন ধরতে কতক্ষণ। লোকে অনেক কিছু বলে কিন্তু উমা কর্ণগোচর করেনা। সকাল বিকালে জোয়ার ভাঁটায় যা মাছ হয় উমা মার্কেটে এনে বিক্রি করে চলে যায়। প্রত্যহ খাওয়া খরচ বাদে মজুরি বাবদ পঞ্চাশ টাকা দেয় অম্লানকে।

জোয়ারে ইলিশের যন্ত্রচালিত ট্রলার মাছভর্তি অবস্থায় কালনাগিনীর খালে আসে। সতর্ক থাকতে হয়। উষা পাটাতনে ছাউনির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের ছোট নৌকা মোচার খলার মতো নাচে। ছন্দে দোলে ঢেউর জন্য।

সেদিনও প্রতিপদের চাঁদ উদয়ের পথে। পাশে কাকদ্বীপ মফঃস্বল শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। আলোর সিগনাল দিয়ে দক্ষ মাঝিরা জালের পাশ দিয়ে ট্রলার চালিয়ে যাচ্ছে। এদেরও নৌকায় কেরোসিনের বোম্বা জ্বলছে। হারিকেনও জ্বলছে। ঊষার ঘুমানোর অবসরে উমার কাছে অম্লান গিয়ে বসল পাটাতনে। দু'জনের কথায় ভেসে আসল দূরে অসীম আকাশে তারাদের কথা। মেঘেরা উড়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে দুরে গাংচিল ঢেউয়ে ভাসছে। কাদা খোঁচা - ভাটিম -জলপিপি মাণিক জোড়া চরে বসে আছে। চাঁদনী রাতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! ঝুঁকে পড়া বানি গাছে পানকৌড়ি - মাছরাঙা - শামুকখোল- টি ট্রিভ বসে আছে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়ে। অম্লান বলল, জাল একখান বারাইলে ক্যান হয়? বারাইবি নে?

- যা চলের চলুক গৈ না। পর দি ভাইব্যা লঅম।

- একখান কথা কইঅম মনৎ লইবা ক?

- কী কথা? নাসৈইন্যা কি কইবি কঅ। অধৈর্য্য হয়ে বলল।

- আঁই যদি তুরার দায় লই অসুবিধা হইব ন্য?

- কিভাবে? আঁয় বিয়া করিয়ারে?

- তয় কাকিরে আগঅদি বুঝন পরিব। সে তুই পারিবি।

-আঁই অন্য কথা ভাবির।

-কি কথা? বিয়া ছারা আর কি?

- তুই আঁরার ভাই ধম্মের ভাই কইরলে মাইনত ফানলা।

উমার মত কর্মঠ কিশোরী ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কথায় অম্লান কিছু বুঝতে পারল না। ধরা সে দেয়নি। যৌবন যার উদ্দমতার হাতছানি দিচ্ছে সে অনায়াসে অম্লানকে ধরা না দিয়েও ধরা দিয়ে গেল। এ যেন ঢেউ।

বারে বারে তীরে এসে ফিরে যায়।

উমার পাশে থেকে থেকে শরীরের সৌগন্ধ তার ভালো লাগে। কিন্তু যৌবন দীপ্ততার ঝাল না থাকলে লুট তো হবেই। ধারে ঘেঁষতে না দেওয়ার ঝাঁঝ তো কথায় কথায় রাখতে হয়। মদে মাতাল হয় কিন্তু অনেকে মাতালের নেশাগ্রস্ত চোখ ভুল ঠিক বিচার বিবেচনা করে না। বিশেষ করে অম্লান কিশোর বয়সের - ফচকে ছোঁড়ার হেঁকড় তো থাকবেই। সেয়না হতে আরও বয়সের প্রাপ্তিভার থাকা উচিত। ঘোলাটে কথার মাঝে বিলোল না হওয়া উমার স্বভাব। যৌবনের মৌতাতে হারাতে চায়না। একেবারে তো আঘাটায় নেই। তবে হ্যাঁ, ছোট বোনেরাও মায়ের প্রতি কর্তব্যের খিদে - মিলেমিশে সুখ শান্তিতে কালাতিক্রম হ'বার খিদে -- ভালবাসার খিদে-- বাঁচার খিদে - সব আগুন প্রশমিত হয় যৌবন খিদের কাছে। সেই বিচক্ষণতা উমার আছে।

ওর চুলের সুবাস আছে। এই বয়সে সব কিশোরী থাকে সাজগোজে চাকচিক্যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ঘরানায়। যা একজন কিশোরীকে মোহময়ী আকৃষ্ট রূপ ব্যঞ্জনায় রাখতে মন চায়। লোনা জলে গা গরম। গঙ্গার স্রোতে ভাসমান নৌকাকে কাষ্ঠ দেবীর মর্যাদা দেয় সকলে। পবিত্রতায় ভরা থাকে ভাসমান নৌকা। ওঠা নামায় প্রণাম করে না কে?

রাত একটার আগে ঘুমে ওরা ঝিমোচ্ছে। উষার ভাতঘুম হতেই জেগেছে, সে উঠে এলো ছাউনি ছেড়ে। বলল, দিদিরে জুয়ার থাইম্যে নে?

-আর বেশি দেরি নাই। উমা বলল।

একটু পরে চাঁদনী আলোয় মাছের ছলা ধরে তুলে নিল। নৌকার খুলে উপুড় করে দিল। আজকের মাছের পৎ আলাদা। ঝুমকা চিংড়ি-- চামনে চিংড়ি-- লাল গুলে -- খয়রা-- বাঁশপাতা-- সালফিশ-- আমুদী -- রুলি চুনা -- হাগরা কাঁটা ইত্যাদি।

আবার ওরা জাল পেতে ঘুমে অসাড়। নামমাত্র একটি ওড়নার পর্দা আড়াল করা থাকে যেখানে দু'বোনে জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

অম্লানের মনে সুড়সুড়ি জাগে -- উঁকি দিয়ে লুকোচুরি খেলে। পরিশ্রমের ঘুম দিয়ে নিদ্রাদেবী বিমুক্ত করে।

দ্রৌপদী বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেনা। কারণ শুকনো লাকড়ি জ্বলন্ত আগুনের পাশে আছে বলে। সকালবেলায় মেয়ের সাথে প্রত্যহ আসে আর কথার মাঝে চোখের দূরদর্শিতায় জরিপ করে মেয়ের শরীর। সন্দেহপ্রবণ পাপাত্মা অত্যন্দ্র প্রহরীর মতো খুঁজে চলে গন্ডদেশ-বক্ষদেশ-ইজ্জত ক্ষয়ের আঁকিবুকি --কথার মারপ্যাঁচ। তার মাঝে চালান টাকা আঁচলের এক খুঁটে বেঁধে নিয়ে উমার দিকে তাকিয়ে বলে, সাওধানে থাকিবি ছুঁটো বুইনেরে লক্ষ্য রাখিবি। ইতার লাই পরোটা ডাইল লই যাইতি।

- হইঅ। কথায় ক্লান্তি মাখা উমার।

- ইতে কিস্যু কইল ন্যে? নৈল্যার বাই?

- কনে কি কইব। জালর পিসনে সময় যারগৈ। উমা চেপে যায় কথাটা।

সে ক্যারেট -নেট -আধা প্লাস্টিক ব্যারেল -নিয়ে দাঁড়িয়ে নৌকার কাছে যাবে একটা ভ্যানের অপেক্ষায়।

ভ্যানে যেতে যেতে মায়ের কথা ভাবছে। মা-ছোট, বোনদ্বয় --অম্লান -- নিজে সবার কথায় সে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কাকদ্বীপ, দঃ চব্বিশ পরগণা

নাটক

ডাকাত দলের কুঁড়ি

লিখেছেন - অশোক দাস চার্বাক



[শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তমনস্ক সাবালকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত শিশুরঙ্গ নাটিকা - বড়রা বালক বালিকা সেজে স্টেজে বা পথে অভিনয় করবেন]

(বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: যাঁরা আজ মাননীয়, তো কাল ঘৃণানীও - আজ মন্ত্রী তো কাল জেলবন্দী আসামী। যাঁদের মান এমনিভাবে ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, যাঁদের মানসম্মান নিতান্ত সরকারী ক্ষমতা নির্ভর, যাঁরা গল্প, কবিতা, নাটক ফিল্মে নিজ নিজ গোপন চরিত্র উন্মোচিত হয়ে যেতে দেখলে পাগলপারা হয়ে ওঠেন, যাঁরা তর্ক বিতর্কের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম, যাঁরা নিজেরদের নাক কান কাটা কার্টুন দেখলে কার্টুনিস্টদের গুঁতোতে থাকেন -

সেই সব মহামান্য মাননীয়াগণ দয়া করে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক পরামর্শমত এ নাটকটি পড়বেন না, দেখবেন না, শুনবেন না অথবা মঞ্চস্থ বা পথস্থ করবেন না। তাঁরা মহাজ্ঞানী তিন হনুমানজীর মত কানে চোখে মুখে হাত চাপা দিয়ে মান আবেগাদির আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন)

[চরিত্র: পল্টু (বড়ভাই ওরফে গলাকাটা মনিরুল), বিল্টু (মেজভাই - ওরফে গব্বর সিং) ছোটকু (ওরফে খুনে আরাবুল), পিঙ্কি (ছোটবোন ওরফে ফুলনদেবী), ইলা (বড়দি), ঠাকুমা, বাবা, মা, মধু (মাঝবয়সী চাকর) ও মাইক্রোফোন।]

(পর্দা ওঠার আগে)

মাইক্রোফোন - আমি বিবেক বলছি।............. নাট্যসংস্থার পরিচালনায় অশোকদাস চার্বাক বিরোচিত আপনারা যে শিশুনাটিকাটির রঙ্গরস উপভোগ করতে চলেছেন সে হাস্যরসের আড়ালে রয়েছে হোমো স্যাপিওন প্রজাতির প্রাণীদের শেষ দিনের পথে অগ্রগতির এক ভয়ঙ্কর বিপদ সংকেত। সিঁদেলচুরী, পকেটমারী, খুন-দাঙ্গা, হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি সাবেকি সনাতন অপরাধ ছাড়া অধুনা আবিষ্কৃত ভোটচুরি, গদিচুরি, বালিচুরি, কয়লাচুরি, গরুচুরি, চাকুরীচুরি, শিক্ষাচুরি, ডিগ্রীচুরি, সম্মানচুরি, বিদ্যুৎচুরি, এম এল এ চুরি, নাবালক-নাবালিকাচুরি, সাইবারচুরি, আইনচুরি, স্কুলের বাচ্চাদের মিডডে মিল চুরি, কাটমানিচোর, সিন্ডিকেটচোর এবং এরকম আধুনিক নব নব নবআবিষ্কৃত ভুরি ভুরি চুরি-জোচ্চুরি, রাজনৈতিক তোলাবাজি, ছাত্রদের টুকলিবাজি, বিদ্বজনের তেলবাজি, মেঠো সভার রংবাজি, লোফারজনের গালিবাজি, ধর্মগুরুর ঠকবাজি, শিল্পী সাহিত্যিকদের ডিগবাজি, জ্যোতিষ শাস্ত্রীদের চিটিংবাজী, পুরুত-গুরুবাবাদের ভোজবাজি, নেতামন্ত্রীর

চালবাজি ইত্যাদি আধুনিক সভ্য সমাজের অসভ্যতার খবরে টিভি, কাগজ, মাঠ-ময়দান, চায়ের দোকান, রকের জটলা কফিহাউসের আড্ডা, ট্রামে বাসে আলোচনা, ভদ্রজনের বৈঠকখানা, গরীবদের কুঁড়ে, ধনীর আমোদপার্টি, মাতালজনের পানশালা, মঠমন্দিরের নাটমঞ্চ, বাচ্চাদের স্কুল,স্কুলবাস, তরুণদের কলেজ ক্যাম্পাস সর্বত্র সদা মুখরিত। সেসব অসভ্য সভ্যতার অশ্লীল প্রদর্শণ এবং টিকা টিপ্পনী সহযোগে খোলাখুলি আলোচনা পর্যালোচনা দর্শন শ্রবণের কার্বাইড গ্যাসে দগ্ধ হতে হতে আমাদের আদরের অবহেলিত শিশু সন্তানেরা ডরকচা হয়ে সবার অলক্ষে অকালপক্ক অকাল অপরাধী হয়ে পড়ছে। তারা বাবা মা গুরুজন-মান্যজন নেতা-মন্ত্রী, বিচারক আচার্য্য, গুরুবাবা, দৈববাবাদের, এমন কি পবিত্র দেবদেবী-পীর-পয়গম্বর অবতারদেরও অবজ্ঞা করতে, তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে, তাদের ঘৃণা করতে প্রশিক্ষিত হচ্ছে। তারা শ্রদ্ধা করার মত মানুষ পাচ্ছেনা। তারা তাদের পিতামাতা, শিক্ষক, গুরুজন, উঁচু মাপের মানুষজনের নীচুমাপের অপকর্ম অপবাক্য অনুকরণ অনুসরণ করে আত্মঘাতী সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। সমাজের উচ্চাসনে থাকা মাননীয় নেতামন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় বিদ্বজন, জনপ্রিয় নাট্যকারদের দুস্কর্মের দৃষ্টান্তবিষ, অসভ্য অশ্লীল বাক্যে ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সমাজ, অসাংবিধানিক বাক্যবিষ নানা মিডিয়া বাহিত হয়ে আমাদের দেশ, আমাদের ঘর সংসার আমাদের জীবনকে বিষাক্ত ও প্রাণঘাতী করে তুলছে। আর আমাদের রক্ষাকারী প্রশাসন আমাদেরই প্রদত্ত করের টাকায় আমাদের শত্রু গুন্ডা ক্রিমিনালদের সুরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রশাসনের অলিতে গলিতে, আদালতের অঙ্গনে-অঙ্গনে।

এসব মজার কথা, এসব হাসির কথা, এসব কান্নার কথা, এসব ভয়ঙ্কর কথা শুনতে থাকুন, দেখতে থাকুন, আর তারপর প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেওয়ালে পিঠ

রেখে খুঁজতে থাকুন সমাধান। অথবা, মানে অথবা অসভ্য বর্বরদের ওপর আপনাদের প্রিয় সন্তানদের রক্ষা করার ভার অর্পণ করে আরো, আরো সম্পদ বাড়াতে থাকুন যেনতেন উপায়ে, আর চোখ বন্ধ করে ভোগ বিলাস উপভোগ করতে থাকুন, তারপর নিজ নিজ সন্তানদের কবর খুঁড়তে থাকুন হলের বাইরে গিয়ে। এ নাটকে যা দেখলেন "সেটা আপনি দেখেননি।"

(পর্দা উত্তোলন)

প্রথম দৃশ্য

(বাচ্চাদের খেলার ঘর)

পিঙ্কি - কিন্তু মেজদা, ঠাম্মা তো এমনিতেই আমাদের নাড়ু-তক্তি দেবে। আমাদের জন্যইতো বানাচ্ছে ওসব - ডাকাতি করবার দরকার কি?

বিল্টু - আরে, ও তো দু চারটে করে দেবে। সকালে দুটো, বিকালে দুটো। কানাই দাদুর হোমিওপ্যাথি বড়ির মত মেপে মেপে, খেপে খেপে, গুনে গুনে। তাও সেই ঠাকুর ভাসানের পর প্রণামের বিনিময়ে। আবার বাড়িতে যারা প্রণাম করতে আসবে তাদেরও দিতে থাকবে। আমাদের সবগুলো চাই, একসাথে, এখুনি। হামরা ভিখারি নেহি হ্যায়। হামরা ডাকাত। হামাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। বীরকা মত, হিরোকে মাফিক হামরা সবগুলো নাড়ু ছিনকে লেগা। বুঝহা বুদ্ধু?

পিঙ্কি- আমার কিন্তু ভাল লাগছেনা মেজদা। বড্ড ভয় লাগছে। ঠাম্মা যদি ডাকাত দেখে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। হার্টফেল করে মরে যায় যদি!

বিল্টু - মেয়েছেলেকা মত বাত বলিস না পিঙ্কি। তুই না (নিজের বুকের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) গব্বর সিং কা ভগ্নি, মন্ত্রীকা ভাগ্নী, জজসাহেবকা নাতনি, লালবাজারকা ভাইঝি!

সব্বার প্রেস্টিজ পাংকচার্ড করে দিবি দেখছি।

পিঙ্কি – না, আমি ডাকাতি করতে যাবো না। ওসব দুষ্টু কাকুরা করে। মধুকাকা বলেছে। আমি তোদের দলে থাকবোনা, আমি মধুকাকার দলে।

বিল্টু – দেখ পিঙ্কি, এটাকে বলে বিশ্বাসঘাতকতা, দলবিরোধী কাজ। এমন করলে তোকে বহিস্কার করে দেব দল থেকে। পাড়ুই করে দেব পেটে ছুরি মেরে। সন্দেশ নাড়ু যা পাবো আমরা তার কিচ্ছু দেবোনা তোকে। আমরা তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব। তুই তখন আঙ্গুল চুষবি ঠাম্মার কোলে বসে।

পিঙ্কি – ঠাম্মা আমায় এমনিতেই দেবে। মা ও।

ছোটকু – ও তো দুচারটে। আমরা এতো এতো খাবো। একসাথে চার পাঁচটা নাড়ু মুখে ঢোকাবো। শুধু খাবো, আর খাবো। কবির সুমনকাকু টিভিতে বলেছে।

পিঙ্কি – আমাকে ডাকাতির নাড়ু না দিলে সব প্ল্যান বলে দেব সবাইকে।

ছোটকু – তাহলে আমরাও তোর আচার চুরির কথা বলে দেব ঠাম্মাকে।

বিল্টু – চিলে কোঠায় থাকবি কুনাল ঘোষ, সুদীপ্ত সেনদের মত। শুটকি হয়ে না খেয়ে মরবি তখন। টিভিতে ওদের দাড়িভর্তি শুকনো মুখ দেখে নিস আর একবার। কুৎসা করার জন্য বারে বারে দেখায় ওদের ২৪ ঘন্টা।

ছোটকু – আর ঠাম্মার ঠাকুঘরের কৌটো থেকে অনুকূল লোকনাথদের নকুলদানা স্কুলের ডেস্কে লুকিয়ে রাখা, দিদিভাইয়ের হজমিগুলি খাওয়া – সব আউট করে দেব।

বিল্টু – তখন আচার কেলেঙ্কারি, নকুলদানা কেলেঙ্কারী সব ফাঁস করে দেব ত্রিফলা কেলেঙ্কারি, সারদা কেলেঙ্কারির মত। ভালোমেয়েগিরি টিরি সব শেষ। লোকে তখন চ্যাছা

করবে। মন্টু ঝন্টুরা 'চোর চোর' বলে চেঁচাবে। রাস্তা ঘাটে বেরুতে পারবিনা। বন্ধুরা কেটে পড়বে। কথাই বলবেনা তোর সাথে। কি লজ্জা কি লজ্জা!

ছোটকু – ভোটে নাবলে ভোটও পাবিনা, খারাপ পার্টির মত অবস্থা হবে।

পিঙ্কি – আচ্ছা বাবা আচ্ছা, যাব তোদের সাথে ডাকাতি করতে। প্রমিস। এবার শান্তি হলোতো?

বিল্টু – এ-এইতো। ল-ক্ষী মেয়ে। কেমন সুন্দর কথা শোনে কুট্টি বোনটা আমাদের। ঝাঁসিকি রানী একেবারে। বড়া হো কোরকে টুম একদম ফুলন দেবী হো জায়গা। দেশকা মিনি স্টার, ফিল্মকা ম্যাক্সি ষ্টার, বলিউডকা সুপার স্টার, চম্বলকি গ্যাং স্টার।

পল্টু – দেখ পিঙ্কী, দলে না থাকলে তোকে ঐ অখাদ্য ভাত-সবজি, ডাল সুক্তো খেয়েই বাঁচতে হবে বস্তির লোকেদের মত। আর দলে থাকলে নাড়ু-তক্তি, আচার-চানাচুর সব পাবি। গাদা গাদা। আমাদের বাড়ির গাড়ি ধোবার কাজ ছেড়ে ডাকাত দলে ঢুকেছিল বলেই না পাঁচু কাকু কাউন্সিলর হয়েছে। যে অন্য লোকেদের গাড়ি ধুতো, সে আজ নিজের গাড়িতে ঘোরে, এসি বাড়িতে থাকে। মাছদোকানী কেষ্টকাকু আজ মিনিস্টার, আই পি এসদের বস।

বিল্টু – দলের কথা বলতে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলবি না।

ছোটকু – ওটা খুব অগ্যান্ত্রিক।

পল্টু – কথাটা অগ্যান্ত্রিক নয়, অগণত্রান্তিক। শব্দটা তান্ত্রিক থেকে এসেছে। তান্ত্রিকদের মত গোপন রাখতে হয় তন্ত্রের মন্ত্র। লাল পার্টির স্লোগান শুনিসনি _ "চোরেদের মন্ত্র, নেতাদের যন্ত্র।"

ছোটকু – তোর আর মাস্টারী করতে হবেনা, যেন কত

ডিকশনারী মুখস্ত। সেদিনতো ‘ভবিষ্যৎ’ বানান ভুল বলে কানমোলা খেয়েছিলি নতুন স্যারের কাছ থেকে। লজ্জা করেনা?

পল্টু – ছি! আমিনা তোদের বড়দা। গুরুজন। গুরুজনদের প্রাইভেট স্ক্যান্ডাল করলে পাপ হয়। গুরুজননিন্দা শোনাও পাপ। দেখিসনি নাস্তিক ছোটকাকু হুঁকোটানা অনুকূল দাদুকে পরজীবী গুরুবাবা বললে মেজপিসী কেমন খেপে যায়, ঠাম্মারা কানে হাত দেয়। গুরুজন ইজ গুরুজন। ওদের দোষের কথা বলতে নেই। ওটাকে বলে কুৎসা। খারাপ দলের লোকেরা করে।

ছোটকু – গুরুজন না ইল্লি। দু-চার বছরের বড় হয়ে একেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন। তোর আর গুরুজনগিরি টিরি করতে হবেনা। আমি তোর কোনো কথা শুনবনা। আমার ব্যাটটাও তোকে আর দেবোনা, তোর ঐ হাতলভাঙ্গা ব্যাটটা নিয়ে তুই খেলিস। জিরো রানে আউট হবি।

পল্টু – ব্যাট না দিলে বাবার বিলাতি পেন ভাঙার কথা বলে দেব মাকে।

বিল্টু – নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়াঝাঁটি করিসনা। এটাকে বলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এতে দল ভেঙে যায়। পাবলিকরা ডাকাত দলকে সম্মান করেনা, বিশ্বাস করে ভোটও দেয়না। সেদিন চা খেতে খেতে মেজকাকু বলছিলো শুনিসনি? বসে বসে তখনতো একমনে কার্টুন দেখছিলি বাচ্চাদের মত।

ছোটকু – পুলিসকাকুরা এমন বলেই থাকে। যত্তসব আজেবাজে উল্টাপাল্টা কথা। সারাক্ষন শুধু হ্যান করেছি, ত্যান করেছি, চোর ধরেছি, ডাকাত মেরেছি, খারাপ পার্টির নেতাকে গুলি করেছি, আমাকে ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এক পাও নড়েননা। যত্তসব মিথ্যা মিথ্যা গ্যাস গুল। বাগান বাথরুম পরিষ্কার সময় কনেস্টবলকাকু আমায় সব বলেছে গোপণে। তোরা আবার ক্লাসে গিয়ে ঢাক পেটাসনা যেন।

পল্টু – তা হোক, বিল্টু কিন্তু ঠিক কথাই বলে। অনেক বেশী বোঝে। আচ্ছা বিল্টু, তুই রাজনীতি, পলিটিক্স, ডাকাতি, গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, সিন্ডিকেটে ফিন্ডিকেট – এত সব জ্ঞানবুদ্ধি জানিস কী করে?

বিল্টু – তোরা তো সব ছেলেমানুষদের মত টম জেরী, ছোটা ভীম, এনিম্যাল প্ল্যানেট দেখেই সময় নষ্ট করিস। বুদ্ধিটা তোদের পাকবে কী করে শুনি। আমি বসার ঘরে বাবার সাথে খবর দেখি, মায়ের সাথে সিরিয়ালের ঝগড়াঝাঁটি দেখি। দিদিভাইয়ের সাথে পুলিশ ফাইল, ভোটকাকুদের ঝগড়া চেচাঁমেচি, পক্ষ-প্রতিপক্ষ, খুন ডাকাতি, সিনেমার মার্ডার খুন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমি নিজে ক্যারেটের প্যাচ করছি, গুলি চালাচ্ছি, মানুষ মারছি। নিজেকে হিরো হিরো মনে হয়। লোকেরা খুনী ডাকাতদের কত খাতির করে দেখেছিস? বাবাকেও এতবার দেখায়না টিভিতে। তাহলে বাবার কি লাভ হলো এত বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে। বড়ো হয়ে আমি ডাকাত হবো। বীরের মত খুন করবো, রেপ করবো, সব, সবকিছু করবো। ছাড়া পেয়ে জেল থেকে বেরুলে সবাই আমার গলায় মালা পরাবে, টিভিওয়ালারা আমার ছবি তুলবে।

পিঙ্কি – খুন, রেপ টেপ খারাপ কাজ। বাবা বলেছে।

বিল্টু – তুই বেশি জানিস? খারাপ কাজ তো পার্টির খুনে বিশুকাকু এলে বাবা এত খাতির করে প্রাইভেট ঘরে বসায় কেন? মধুকাকার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে মা নিজে ওকে চা দেয় কেন? বড় মামা মন্ত্রী হয়েও ওদের বিলাতি মদ সিগারেট দেয় কেন? ভোট কাকুরা পায়ে পিষে মারবো, পুলিশের মাথায় বোমা মারবো, রেপ করে দেব, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব বলে ভয় দেখালে মিটিংয়ের ভদ্রলোকেরা সিটি মারে, হাততালি দেয় কেন? বল বোকাবুদ্ধুরা।

পল্টু – ঠিক বলেছিস, আমিও দেখেছি টিভিতে। যে বেশী খারাপ কথা বলে সে তত জনপ্রিয় ভোটারপ্রিয় হয়।

মানসম্মান বাড়ে।

পিঙ্কি – রেপ জিনিসটা কেমন অস্ত্ররে বড়দা? আমি কখনো দেখিনি। ছোরার মত, না বল্লমের মত। ওটা দিয়ে কামদুনি দিদিদের খুন করে কী করে? টিভিতে কী সব হাবিজাবি বলে বুঝি না।

পল্টু – ও– তুই এখন বুঝবি না। শুনেছি রেপ করে খুন করা নাকি বড্ড অসভ্য কাজ। রাস্তায় হিসু করা থুথু ফেলার মত নোংরা। কামদুনি বারাসতের দামাল ছেলে মেয়েরা ওসব করে বলে ক্লাস নাইনের সুকান্তদা সেদিন কাকে যেন বলছিল স্কুলবাসে। তবে তোদের মত ছোট ছেলেমেয়েদের নাকি ওসব অস্ত্র হাতে নিতে নেই। বড় হলে নিজের চোখই দেখতে পাবি অস্ত্রটা।

পিঙ্কি – অস্ত্রটাতে ছোটদের হাত দিতে নেই কেনরে বড়দা?

পল্টু – ঐ যেমন ছোটদের সিগারেট খেতে নেই আর কি। তবে বড়রা রেপ দিয়ে খারাপ পার্টির লোকজনদের খুন করলে দোষের কিছু হয়না। তাই মেজকাকু আর তার থানার কনেস্টবল কাকুরাও সে খুনিদের ধরে না।

পিঙ্কি – তাহলে তোপসে মেসো কেন বলেছে যে তার ছেলেমেয়েদের খারাপ লোকেদের বাড়িতে ঢুকিয়ে রেপ ছুরিবন্ধুক দিয়ে সবাইকে খুন করতে? উমাদি পঞ্চুদাদারা কি ছোট নয়? আমিও দামাল মেয়ে। আমার ডেস্ক থেকে নকুলদানা চুরি করলে সন্তু শয়তানটাকে রেপ করে দেব একেবারে। ছোট বড় কিচ্ছু মানবো না।

ছোটকু – ছি! পিঙ্কি, ওসব কথা মুখে আনবিনা। রেপ দিয়ে কী করে খুন করতে হয় জিজ্ঞেস করতে ঠাম্মা সেদিন একেবারে রেগে কাই। চিৎকার করে বললো "টিভিটা এবার গুঁড়ো গুঁড়ো করে নর্দমায় ফেলে দেব। আনন্দবাজার, উনিশ কুড়িও ঢোকাবোনা বাড়িতে।" কিচ্ছু মাথায় ঢুকলোনা।

এমন ঠান্ডা ঠাকুমা যেন সিরিয়ালের ঝগড়াটে শাশুড়ি হয়ে গেল।

পল্টু – ছাড় ওদের ওসব কঠিন কঠিন কথার হেঁয়ালি। ওরা এসব আজেবাজে বকবক করেই থাকে। ওরা কি বলে, কি চায়, কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ কিচ্ছু বোঝা যায়না। শুধু জেনে রাখ, ডাকাতি একটা মহৎ কাজ। এতে অনেকের মুখে হাসি ফোটে। এই যে আমরা ঠাম্মার নাড়ু ডাকাতি করবো, এটা একটা জনসেবা। নাড়ু খেতে খেতে আমরা হাসবো, আমরা মজা করবো। মানুষের সেবা করব।

বিল্টু – শুনলিতো বড়দার কথা। খারাপ কাজ সবাই করে। আমরাও করি, বড়োরাও করে। পিঙ্কির ডেস্কে যেমন আমসত্ত্ব নকুলদানা আচার লুকানো আছে, মেজকাকু-মামাবাবুদের তেমনি দু নম্বরী টাকাও আছে লুকানো। আমি সব শুনেছি – রাঙামেসো ছোট মাসিকে ফিসফিসিয়ে বলছিলো মন্টুর মুখেভাতের দিন। কে আচার চুরি করলো, কে লোকনাথবাবার নকুলদানা সরালো, এসব তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাথা খারাপ করা ঠিক কাজ নয়। ওসব শুধু কুৎসা। মমতাদিদাও তাই বলেছে। এখন আমাদের কাজ করতে হবে – শুধু কাজ। মানুষের সেবা করতে হবে, নাড়ুহীন গরীবের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, নাড়ু-তক্তি খেতে হবে।

ছোটকু – (হাততালি দিতে দিতে) হুই হুই। ফাটাফাটি। মনে হচ্ছে যেন দেব মামা ভাষণ ভাসাচ্ছে ঘাঁটালের তেঁতুলতলায় মাঠে, যেন বিমানদাদু মনুমেন্ট তাতাচ্ছে ময়দানে, যেন বাবুলকাকু কপালে লালটিপ পরে গলা ফোলাচ্ছে আসানসোলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য – (ঠাকুমার ঘর)

ঠাকুমা – বাচ্চারা সব ওপরে খেলছে। এবার বল তোর গোপন কথা।

মধু – তোমার নাতি নাতনিরা শুনলাম তোমার নাড়ু চুরি

করবে ষড়যন্ত্র করছে।

ঠাকুমা – তাই নাকি! তাহলেতো একটা ব্যবস্থা করতে হয় দেখছি। কী করি বলত? খোকাকে একটা ফোন করব নাকি লালবাজারে?

মধু – চোর ডাকাত ধরা কি পুলিশের কর্ম, না নেতা-মন্ত্রীদের ধর্ম। যে যার নিজের নিজের সোনাদানা, মান সম্পত্তি নিজেদেরই বাঁচাতে হবে বলে নেতারা বলেছেন। চোর ডাকাত সব ধরে ফেললে ভোটে নেতা মন্ত্রীদের জেতাবে কে, চোরের টাকা কেড়ে নিলে ভোটের খরচ জোটাবে কে?

ঠাকুমা – ঠিক বলেছিস তুই। তোকে মিছেমিছি সবাই বোকা হাবলা বলে। তুই লেখাপড়া না জানা মূর্খ হয়েও যা জানিস বুঝিস, আমার বুদ্ধিজীবী ছেলে ভাগ্নেরাও তা বোঝেনা। বুঝলেও চাকরি যাবার ভয়ে, কিংবা আরো বড় চাকরির লোভে সবাই চাটুকারী করতে থাকে মুক্ষু নেতা-মন্ত্রীদের। সে যাই হোক এখন আমি কী করি বলত?

মধু – তুমি লালবাজারের মা, নবান্নের মাসি, হাইকোর্টের বোন – তোমাকে আমার মত চাকর আর কী উপদেশ দেবে। তবে একটা কাজ করতে পার। এত বড় সিন্ধুকটাতো আজকাল কেউ ব্যবহার করো না। নাড়ুর কৌটোগুলো ওতে পুরে তালা চাবি মেরে রাখো।

ঠাকুমা – ঠিক বলেছিস, তাই করব। দিনে দিনে তোর বুদ্ধি পাকছে দেখছি।

মধু – সবই তোমাদের কৃপা মা, তোমার আর দাদা বৌদিদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কাজকর্ম দেখতে দেখতে আমার সব শিক্ষা।

ঠাকুমা – ওদের কাছে কিছু শিখতে যাসনা বাবা। পৃথিবীতে অন্তত তোর মত দু চারটে বোকা হাবা মানুষ বেঁচে থাকুক যাতে করে ভগবানের তৈরী সুন্দর পৃথিবীটা বেঁচে থাকে।

মধু — বুঝলাম না তুমি কী বললে। আর একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি, তোমার ঐ মেজকাটাই হচ্ছে পালের গোদা। হাড় বজ্জাত। সবাইকে বুদ্ধি দেয়। আমায় শাসিয়ে বলে সে নাকি প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের থেকেও বড় ডাকাত হবে। আর তোমার হয়ে স্পাইগিরি করবার জন্য ফাঁসিতে ঝোলাবে আমায়।

ঠাকুমা - ওদের আর কি দোষ দেব বল, চারিদিকে যা দেখছে, যা শুনছে তাই বলছে। গুরুজনদের, নেতাদের, সিনেমা সিরিয়ালের হিরোদের নকল করে তোতাপাখির বুলি বলছে - কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে। এরপর একদিন দেখবি সব বাড়িতে বাড়িতে চোর ডাকাত জন্মাবে। তারা একদিন তাদের বাবা-মা-নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ -জজ-সাহেবদেরও খুন করবে। তারা তাদের মা-বোনদেরও ইজ্জত নষ্ট করবে। কেউ রেহাই পাবে না, এই আমি বলে দিলাম।

মধু - আমি মুক্ষু মানুষ, তোমার কথা তেমন ঠিক বুঝতে পারি না। তুমি কত কী জানো। সেদিন মহিলা মহলের জমায়েতে সবাই তোমার জ্ঞানবুদ্ধির সুনাম করছিলো। তাই তুমি এতগুলো সোনার চাঁদ রত্ন পেটে ধরেছ।

ঠাকুমা - তার চেয়ে তোর মত সাদা সরল অশিক্ষিতদের জন্ম দিলে শান্তি পেতাম। ওদের অপমানে যে আমার অপমান। মরার আগে পৃথিবীটাকে কেমন রেখে যাচ্ছি জানি না।

মধু - তোমার কথা বুঝতে পারি না। হেঁয়ালি হেঁয়ালি লাগে। যাকগে, পরে বুঝে নেব। এখন আমি বাইরের কাজ সেরে মুদির দোকানের জিনিসগুলো নিয়ে আসি।

ঠাকুমা - তাই যা বাবা। যাবার আগে একটা কাজ করে যা। ছাতে শুকোতে দেওয়া নিমপাতার বড়িগুলো এনে দিয়ে যা।

মধু – এখুনিই কি লাগবে মাঠাকরুন? ভাল করে শুকোয়নি বোধ হয়।

ঠাকুমা – একটু নরম থাকা ভালো। শুকনো খটখটে হয়ে গেলে বাচ্চাদের গলায় লাগতে পারে। কিছু নাড়ুর ভেতরে নিমবড়িগুলো পুরে দেব পুলি পিঠের পুর দেবার মত। ওগুলো আলাদা কৌটোয় রাখবো। আর প্রতিদিন সকালে একটা করে দেব বাচ্চাদের।

মধু – সে কি মা ঠাকরুন! মিষ্টি নাড়ুর ভেতর নিঁমবড়ির পুর! এমন মিষ্টান্নের কথা তো সাত জন্মেও শুনিনি।

ঠাকুমা – নিমপাতা, চিরতা কালমেঘ খুব উপকারী, কৃমিনাশক, লিভার ভাল রাখে। এমনিতে খেতে চায় না। এবার পটাপট খেয়ে ফেলবে নাড়ু খেতে খেতে।

মধু – ভালো বুদ্ধি বার করেছো। আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

তৃতীয় দৃশ্য (বাড়ির ছাদ)

বিল্টু – দেখো ভাইও আর বহিনো, ঠাম্মা কয় দিন দুপ্পুরমে দরজা বন্ধ করকে বহুত নাড়ু বানায়া হ্যায়। দশ বারোটা কৌটামে পুর কোরকে আলমারিমে রেখেছে। আরো রাখেগা। হ্যাম দরজাকে ফুটামে সব দেখেছি হ্যায়। ওসব নাড়ু হামরা ডাকাতি করেগা।

ছোটকু – ঠিক আছে, চল এখুনি।

বিল্টু – এখন নয়, মানে অবভী নেহি। একটু বাদমে বাবাশ্রী মাতাশ্রী দিদিশ্রীরা পূজা মার্কেটিংমে গড়িহাহাট্টামে জায়গা। মধুকাকাশ্রীভি মুদ্দীকা দোকানে জায়গা ওই টাইম মে। ঠাম্মা একলা ঘরে রহেগা। ওই সময়মে হামরা ডাকাতি করেগা। রান্নাদিদাও মাইনে দিতে ছেলের বাড়িমে গিয়েছে।

পিঙ্কি – কিন্তু দশ বার কৌটো নাড়ু খাবি কি করে? পেট

ব্যাথা করবে না? বমি হয়ে যাবে যে।

বিল্টু – হিন্দিমে বল। এখুনি সব কাহে খায়েগা। চুপকে চুপকে, রাখকে রাখকে খায়েগা। চোরকাকু, ডাকাতকাকু, নেতা মন্ত্রীরা কি এক সাথমে সব আইসক্রিম কিনতাহা নাকি?

পিঙ্কি – কিন্তু রাখবি কোথায়? মধুকাকা ঠিক খুঁজে বার করবে। সিবিআই, ইডির বাপ্ একেবারে। এ জন্যইতো আচার নকুলদানা আমচুর আমসত্যগুলো স্কুলের ডেস্কে রাখি।

বিল্টু – খামোশ, বুদ্ধুকা বাপ্ – সরি বুদ্ধুকা মা, মিনমিনে নরম নরম সৌখিন বাংলা বাত একদম বলবি না। গরম গরম কড়া কড়া হিন্দি বাত শুনে ঠাম্মা বুঝেগা হামরা দুবলা পাতলা বাংগালী বাবু ডাকাত নেহি হ্যায়। চম্বলকি ডাকু, তাপসকাকুর মত চন্দননগরকা আসলি মাল।

ছোটকু – কিন্তু আমিতো এতটুকু হিন্দি বলতে পারি না।

বিল্টু – আরে শোন, হিন্দি ভাষাটা বাংলা থেকেই এসেছে। যে বাংলা জানে সে হিন্দিও জানে। খুব সহজ ভাষা। বাংলাটা একটু জোর দিয়ে, দাঁত চেপে বলবি, ব্যাস সুন্দর হিন্দি হয়ে যাবে। দুপুরকে বলবি দুপ্পুর, পিঙ্কিকে বলবি ফিংকি, ফিঙ্খীও বলতে পারিস। আমাদের হিন্দি বাত শুনে ঠাম্মা খুব ভয়-মানে ডোরেগা, আর সুর সুর করকে সব নাড়ু-তক্তি বার কর দেগা।

পল্টু – ঠিক বলেছিস গুরু। হামরা সক্কলমে ভোটকা নেতাদের মত খারাপ খারাপ বাত বলেগা। যেতনা খারাপ বাত বলেগা, আদমি লোক তেতনা ডোরেগা, ভোটারলোক তেতনা খাতির করেগা।

বিল্টু – গু-ড। এইতো চাহিয়ে। মানে আইসা মাফিক বাত করেগা। এবার শুনে লো হামরা প্ল্যান। গত বছর হলইনডেতে সানফ্রান্সিস্কোমে যে যে মুখোশ পরেছিলাম

সেগুলা খুঁজে বার কর। মনে হোতা হ্যায় মধুকাকু ওগুলো চিল্লে কোঠামে রাখা হ্যায়। আমি পরেগা ভূতকা মুখোশ, দাদা পরবে ড্রাকুলার, ছট্টু হবে এদেশী মহিষাসুর, আর পিঙ্কি হবি কালীপূজাকা ডাকিনি। ঠাম্মা আমাদের চিনতেও নেহি পড়েগা, ভয়ও পায়েগা। ভাবেগা আমরা সব ওর নাতি নাতনী নেহি হ্যায়। ঠাম্মা তখন থর থর কোরকে কাঁপেগা, আর সুর সুর কোরকে সব নাড়ু পটাপট বার কর দেগা।

ছোটকু – কিন্তু ঠাম্মাতো সব নাড়ু আলমারিমে রাখতা হ্যায়। চাবিভি দেতা।

বিল্টু – কোই বাত নেহি। ঠাম্মা সব সময় মে ছাব্বি উস্কা কোমরমে গুঁজ করকে রাখতা। "চৌধুরী কোঠিমে ডাকাইতি"সিরিয়ালের আরাবুল মনিরুরুলরা যেমন পদ্মপিসির কোমরসে ছাব্বি নিয়ে আলমারী খুল্লা, সে রকম হামরাও ঠাম্মাকা কোমর থেকে জোরসে নিয়ে লেগা ছাব্বি।

পিঙ্কি – কে কয়টা নাড়ু খাবে মেজদা?

বিল্টু – হ্যাম সর্দার হ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে মাফিক ডাকাতরাজা। সবচেয়ে বড়হা ডাকু – গভভর সিং। আধা নাড়ু হাম খায়েগা।

পল্টু – এটা ঠিক নয় মেজো, আমি বড়দা। তুই যদি মুখ্যমন্ত্রী হোস তো, আমি প্রধানমন্ত্রী।

পিঙ্কি – ঝগড়া করিস না দাদারা। ঠাম্মা এত্ত নাড়ু করেছে যে আমরা অর্ধেকও শেষ করতে পারবো না।

ছোটকু – আমরা আজ পেট পুরকে অনেক নাড়ু খায়েগা। বাকি সব তোর খেলনা বাক্সে লুক কোরকে রাখ দেগা পার্থদাদু, অর্পিতা দিদার মত। বাদ মে খায়েগা।

বিল্টু – ঠিক হ্যায়। পেট ভরে গেলে আম্মিও বাকি নাড়ু বাচ্চুকে পাসমে রাখ দেগা। ঐ নেতা-মন্ত্রী, ভোলামেশো, নীরব কাকুরা যেমন লুকিয়ে টাকা রাখে বিদেশের মামার কাছে। আমি সব খবর লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছি।

পল্টু – কিন্তু বাচ্চু যদি সব বলে দেয় ডাকাতির কথা।

ছোটকু – ও লোভিটাকে দু চারটে নাড়ু দিয়ে দিলে কাউকে কিছু বলবে না।

পল্টু – আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। আগে তো ডাকাতিটা শেষ কর। ভাগাভাগিটা পরে হবে। এবার ডাকাতির প্লানটা আর একবার বুঝিয়ে বল সব মেম্বারদের।

বিল্টু – কালীপূজামে যে পিস্তলগুলো ছোটটা মাম্মা দিয়েছিল, ওগুলো সবাই হাতমে ধরেগা। সব পিস্তলমে ক্যাপ লোড কোরকে রাখেগা।

পিঙ্কি – কিন্তু আমার যে পিস্তল নেই। আমার ভয় করে বলে মামা আমাকে শুধু একটা পুতুল দিয়েছিলো।

ছোটকু – কোই বাত নেহি পিঙ্কি। ভাসানমে যাবার সময় মহিষাসুরের হাত থেকে পোড়ে যাওয়া ছোরাটা আমার কাছে আছে। ওটা তুই নিবি হাতে।

বিল্টু – গ্রেট আইডিয়া ছোটকু। একেবারে দাদ্দাকা ভাইয়া। তোর ডাকাতিয়া দিক্ষানাম রাখলাম 'খুনে আরাবুল'।

পিঙ্কি – ছোরা নিয়ে আমি কি করব? সিরিয়ালের পদ্মাবাঈয়ের মত ঠাম্মার গলা আমি কাটতে পারবোনা।

বিল্টু – আরে বোকা, গলা কাটতে হবেনা তোকে। ঐ হাল্কাপলকা ঠাকুরসাজানো ছুরিতে কাটাও যাবেনা। শুধু ওটা ওর গলার নলিতে ঠেকিয়ে রাখবি। ব্যাস।

পিঙ্কি – ঠাম্মা যদি ভয় পায়?

বিল্টু – আচ্ছা বুদ্ধু লেড়কীতো। ভয় না পেলে আলমারিকা ছাব্বি দেবে কাহে ঠাম্মা? ডাকাতকে গালমে চুম্মা খা কোরকে কেউ তোকে নাড়ু দেবেনা বোকারামী।

আমরাতো তখন আর ঠাম্মার নাতি নাতনী থাকবোনা। তখন হয়ে যাবো ডাকাত ডাকাতিনী। তখন আমরা মানুষও থাকবোনা। হয়ে যাব দলের নেতা–খুনি।

পিঙ্কি – ঠাম্মা যদি কাঁদে?

বিল্টু – কাঁদনে দো। পরমে ঠিক হয়ে জায়গা। ঠাম্মা এখনি কাঁদে তো তখনি হাসে। দেখলিনা, ‘বিন্দুর ছেলে’ দেখতে দেখতে কত কাঁদলো, এরপর টিভি বন্দ করে চোখ মুছ কোরকে ছোটকুকে কোলে টেনে আদর করতে করতে কত্তো হাসতে থাকলো।

পিঙ্কি – ঠাম্মা কাঁদলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো বলে দিচ্ছি। (কান্না)

পল্টু – এই জন্য কাঁদুনে প্যানপ্যানে মেয়েদের কেউ ডাকাত দলে নেয় না। মন্ত্রিসভায়ও শুধু দুটো একটা ডাকাবুকো মাসী থাকে। সব ভণ্ডুল করে দেগা দেখছি।

বিল্টু – শোন পিঙ্কি, মেরে বহীন। আজকাল মেয়েরা প্লেন চালাচ্ছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে। ওদের কেউ কোনোদিন কাঁদতে দেখেছে? ফুলনদেবিকা ফিল্ম দেখা নেহি? কি সুন্দর ফটাফট গুলি করকে করকে কত্তো পুলিশ কত্তো মানুষ মেরেছে বলতো। আর তুই হামার মত এত্তো বড়া ডাকাতকে বোন হয়ে আইসা কথা? পাবলিক ক্যা বলেগা তুমকো? ক্যা বলেগা আমাকে। তুই না ঝাঁসি কি রানী, চম্বালকা ফুলন, ‘খুনি কৌন’ সিরিয়ালের হীরাবাঈ। তবু মুখ গোমড়া! দাদা, তুই ওকে বোঝা। তা না হলে পেত্নীটা সব মাট্টি কর দেগা দেখছি।

পল্টু – কাঁদিসনা পিঙ্কি। ঠাম্মা খুব শক্ত আদমি হ্যায়। মানে শক্ত আওরাত। ডাকাত দেখকে নেহি কাঁদেগা। ঠাম্মা পুলিশ বড়সাহেবকা মা, একথা জনতা? জজসাহেবকা দিদি।

ছোটকু – কিন্তু ঠাম্মা নাকি তার ছোটবেলায় থালা ছুঁড়ে গলা কেটেছিল বাংলাদেশের ডাকাতকে। এখন যদি হামানদিস্তা ছুঁড়ে মারে তখন কি হবে।

বিল্টু – হা! হা! হা! শনি মনসার পাঁচালীর মত ওসব গুলগাপ্পা ঠাম্মাকা রামধাপ্পা। তোদের ঘুম পড়ানোর সময়মে

ঠাম্মা ওসব বোলচাল মারটা হ্যায়। ঐ রোগাপটকা মহিলা ডাকাত মারেগা? ছোঃ!

পল্টু – তা ছাড়া আমরা ঠাক্মার আমলের আদ্যিকালের লাঠিধারী পান্তা খাওয়া ন্যাতা ন্যাতা ডাকাত নেহি হ্যায়। হামরা কমপ্লান খাই, হরলিক্স খাই, শক্তিমান বিস্কুট খাই, পিস্তল চালাই – এবার বুঝা?

পিঙ্কি – বুঝা।

ছোটকু – বহুত বুঝা, বহুত সমঝা।

বিল্টু – এবার কে কি করবে সেটা মন দিয়ে শোন। বাবা মা মধুকাকারা সব বেরিয়ে গেলে আমরা স্লোগান দিতে দিতে তিন তলা থেকে নামতে থাকবো। মিছিল থেকে আসা গুলি বীরভূমের পুলিশকাকুকে মারার পর মিছিলকে খুব ভয় পায় ঠাম্মা। এবার ম্যাপটা ভালো করে দেখ। এটা ঠাম্মার ঘর। এই দেখ বাঁ দিকের দেয়ালের গোল দাগ দুটো আলোর সুইচ। ছোটকু আগে ঢুকবে ঠাম্মার ঘরে। ঢুকেই বড় আলোটা নিভিয়ে দেবে। ছোট আলোটা জ্বলতে থাকবে। এরপর আমি আর দাদা ঢুকে ঠাম্মার মাথার দিকে পিস্তল তাকে করে রাখবো। ছোটকু এই দড়িটা দিয়ে ঠাম্মার হাত পা বেঁধে ফেলবে। বাকি কাজ – কাল্লু-মধুমিতার সিরিয়ালের মত। নাড়ুগুলো নেওয়া হয়ে গেলে আমার এই পুরানো স্কুলব্যাগটায় কৌটোগুলো পুরে ফেলবে দাদা। এর মধ্যে পিঙ্কি ঠাম্মার মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে দেবে। ঠিক যেমন হীরাবাই মধুমিতাকে করেছিল। তারপর তোরা সবাই একে একে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে যাবি। বোমা তো নেই, তাই মাঝে মাঝে পিস্তলের ক্যাপ ফাটাবি। আমি শেষকালে বেরিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে দেব। সব্বাই প্লানমত নিজের নিজেরে ডিউটি করেগা। উইশ্ ইউ গুড লাক লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান।

ছোটকু – এর মধ্যে রান্না দিদা যদি ছেলের বাড়ি থেকে

ফিরে আসে?

বিলটু – ও মাকে বলে গেছে রাত হবে ফিরতে। সব খবর আমি নিয়ে রেখেছি। তবে বাই চান্স যদি আগে এসে যায়, তাহলে ওর নাতির জন্য দু চারটে ডাকাতিয়া নাড়ু দিয়ে দিলে চুপ করে থাকবে লক্ষী পুলিশ দারোয়ানদের মত। কাউকে কিছু বলবেনা, ঠাম্মার কাছে এফ আই আরও করবেনা। রাতের বেলায় বিস্কুট ছুঁড়ে রাস্তার নেড়ি কুকুরদের চুপ করিয়ে রাখে চোরেরা-সেকথা জানিস? চা খেতে খেতে মেজোকাকাশ্রী বাবাকে বলছিলো। আমি এক মনে ছবি আঁকতে আঁকতে সব শুনছিলাম মেঝেতে বসে। বিরোধী নেতা, লেখক,আর্টিস্টরাই নাকি সব চুপ করে থাকে ঐ ডগ বিস্কুটের লোভে, তার রান্নাদিদা।

পল্টু – তুই বড্ডো পাকা পাকা কথা বলিস। চুরি কেলেংকারী ডাকাতি রাজনীতির অনেক কথা জানিস। বড় হলে তুই নেতা মন্ত্রী হয়ে যাবি। পড়াশুনা করে মামা কাকাদের মত কঠিন কঠিন আই এ এস, বি সি এস পরীক্ষা দিতে হবেনা।

বিল্টু – ছোটোকাকুও আমার প্রতিভা দেখে সেই কথা বলে বটে। সে সব ভাববো পরে। এখন তোরা চিলি কোঠামে যা কোরকে ড্রেসাপ করতে থাকে। পিঙ্কিকে নিয়ে আমি ততক্ষন দেখে আসি বাবা মায়েদের আর কত দেরি বেরোতে।

চতুর্থ দৃশ্য (ঠাকুমার ঘর)

(ঠাকুমা বই পড়তে পড়তে জনান্তিকে স্লোগান শুনে চমকে উঠলেন।)

বিল্টু, পল্টু, ছোটকু, পিঙ্কু (চারজন এক সাথে) – আমরা ডাকাত দল

পল্টু, ছোটকু, পিঙ্কু (তিনজন একসাথে) – ডাকাত দল

ছোটকু, পিঙ্কি (দুজন এক সাথে) ডাকাত দল

পিঙ্কি – ডাকাত দল

(চারজন একসাথে) – আমরা খুন করি

(তিনজন একসাথে) – খুন করি

(দুজন একসাথে) – খুন করি

পিঙ্কি – খুন করি, খুন করি

(একই ভাবে "আমরা গুলি করি", "আমরা গলার নলি কাটি ", "আমরা ঘর জ্বালাই", "আমরা পায়ে পিষে মারি," "আমরা বটি দিয়ে গলা কাটি", "জয় শ্রী রাম" ইত্যাদি বর্তমান রাজনৈতিক সমাজের স্লোগান শোনা যাবে) [ঠাকুমা ঠক ঠক করে কাঁপছেন। একে একে চারজন ডাকাত চোরা পিস্তল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সবাই পিস্তল তাকে করে ঠাকুমাকে ঘিরে ধরলো। পিঙ্কি তার ছুরিটা ঠাকুমার বুকে ঠেকিয়ে রাখলো]

বিল্টু – এয়াই ঠা – সরি এয়াই বুড্ডি – একদম চিল্লামিল্লি মত্ করো। হ্যাম গভভোর সিং হ্যায়। একটু শব্দ করেগাতো আকদ্দম কামদুনি কর দেগা। রানাঘাট কর দেগা। তারপর পিঠমে ছুরি ঢোকায়েকে খালমে ফিক দেগা।

পল্টু – হাম চন্দননগরকা মাল হ্যায়, বেশি বাড়াবাড়ি করেগাতো বোঁঠি দিয়ে নলি কাট দেগা। পুলিসকা মা, মন্ত্রীকা পিসী বলে নেহি ছোড়েগা। পুলিশ হামকো ভয় ভি পাতা হ্যায়, ডর ভি করতে হ্যায়। আর এগুলো খেলনা পিস্তল নেহি। মনিরুল ভাইয়া – একটা গোলি ফাটাকে দিখাও বুড্ডিকো।

ছোটকু – হ্যাম খুনি মনিরুল। সিংভূমকা এম এল এ। এই দেখো। (শুণ্যে গুলি) এবার কথা নেহি শুনেগাতো বুকমে গোলি মার দেগা। অরে এ বুড্ডিতো একদম ভয় নেহি পাতা হ্যায়।

বিল্টু – এয়াই বুড্ডি মিটি মিটি হাসতাহা কাহে? পুলিশকা মা বলে রেল্যা হো গিয়া, না? কোই নেহি আসেগা তুমকো বাঁচাতে। তোমার ঐ লোকনাথটাও শুধু চোখ গোল গোল ড্যাব ড্যাব করকেকরকে আর অনুকূল দাদুও গড়গড়ামে ফুঁ দিতে দিতে চোখ ফ্যাল ফ্যাল করে দেখেগা আমাদের ডাকাতি। এয়াই মনিরুল ভাইয়া, উল্টা দো লোকনাথদাদু, অনুকূলদাদুকো, ছিনকে লেলো ওদের নকুলদানাকা বোত্তল।

ঠাকুমা – লোকনাথ অনুকূল বাবাদের মেরোনা ডাকাত ভাইরা। ওনারা বড় ভালো ঠাকুর। আমায় বাঁচাও বাবা লোকনাথ, আমি মোরে গেলে আমার নাতি নাতনিরা খুব কাঁদবে। বিল্টু – ভাঙ দো লোকনাঁথকো। মরুক ব্যাটা। দেখি কোন লোকনাথ তোমাকে বাঁচায়।

ঠাকুমা –এই নাও আলমারীর চাবি। লোকনাথকে ভেঙোনা।

পল্টু – (চাবিটা হাতে নিয়ে) খুব ভালো লেড়কি। থ্যাংক ইউ বুড্ডি। (আলমারিটা খুলে) এতো মাত্র দুটো কৌটা হ্যায় রে গব্বর সিং।

বিল্টু – আরো কৌটো আছে। হ্যাম সব দেখেছি। দুসরা জায়গামে রাখ দিয়া মনে হচ্ছে। উ সিন্ধুক খুলতে হবে দেখছি। আমসত্ব আচার সব ওখানেই রাখতা হ্যায়। বড্ড চাল্লু বুড্ডি।

পল্টু – কিন্তু সিন্ধুককা ঢাকনাতো বহুত ভারী।আমরা খুলতে নেহি পারেগা। আজমে দুটো কৌটা নিয়ে চল। বড় দেরি হো গিয়া। বাবা, মানে বাড়ির লোকেরা ফিরে আসতে পারে।

বিল্টু – ঠিক বলেছিস। ফুলন, সেলোটেপ মার্ দো বুড্ডিকা মুখ মে। এয়াই বুড্ডি, কাল হামরা আবার আসেগা। মধু কাক্কাকে বোলকো সিন্ধুক খুল্লা রাখেগা, সমঝা?

ডাকাতিকা কথা কাউকে বলেগা তো হামারা পুলিশ ভাইয়া তুমকো বাঁধকে থাননামে ঢুকা দেগা। হ্যাম লোক যা যা বলেগা পুলিশ তাই তাই করেগা। বুঝা?

পল্টু – কাল সিন্ধুক খুল্লা রাখেগা। কথা না সুনেগাতো গোল্লাকে নলি কাট দেগা।

পিঙ্কি – আর আমি তোমাকে রেপ কর দেগা।

(সবার একে একে প্রস্থান। খানিক বাদে দরজা খোলার শব্দ, মধুর প্রবেশ)

মধু – এ কি মা ঠাকরুন, তুমি ঘরে, বাইরে শেকল তোলা, একী, মুখে সেলোটেপ! (সেলোটেপ খুলে ঠাকুমার হাত পায়ের বাঁধন খুলতে লাগলো)

ঠাকুমা – চুপ, এইমাত্র চার চারটে বড় বড় ডাকাত ছুরি বন্ধুক দেখিয়ে আমার দু কৌটো নাড়ু নিয়ে গেছে।

মধু – সেকি মা ঠাকরুন, ডাকাতি করতে এসে শুধু নাড়ু –

ঠাকুমা – হাঁরে বাবা, হাঁ। তিন তলার ঘরে বোধ হয় ডাকাতির মাল ভাগ হচ্ছে।

মধু – মানে, ডাকাতরা এখনো আছে ঘরে?

ঠাকুমা – দেখে আয়গে যা। তবে সাবধান, ওরা খুব বড় বড় ডাকাত ডাকাতিনী। গভবার সিং, মনিরুল, আরাবুল, ফুলনদেবী সব্বাই এক সাথে, এক দলে।

মধু – একা একা যাই কি করে, যদি ছুরি বন্ধুক চালিয়ে দেয়! যা দিন কাল পড়েছে, টিভি খুললেই খুন, ডাকাতি, অসভ্যতা, খারাপ খারাপ গালাগালি। এখন কী করি বলতো? একটা ফোন করব নাকি থানায়?

ঠাকুমা – পুলিশকে না জানিয়ে ওরা ডাকাতি করতে এসেছিলো নাকি! ওদের গণধোলাইয়ে ভয় নেই? পুলিশ ছাড়া কে বাঁচাবে ডাকাতদের।

মধু – অন্ততঃ মেজবাবুকে একটা ফোন করি।

ঠাকুমা – ওর কি আর সে সময় আছেরে যে চোর ডাকাত খুনিদের ধরার ফালতু কাজে আসবে। ওর এখন ভি আই পি ডিউটি। কোন জেলবন্দী মন্ত্রী, না এমএলএ আসামিকে গারদ থেকে আদালতে নিয়ে যেতে হবে এসকর্ট করে।

(কর্তা গিন্নীদের প্রবেশ)

মধু – (হন্তদন্ত হয়ে) সব্বোনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু, ঠাকরুনের হাত পা বেঁধে

কর্তা – বলিস কি রে, এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা!

ঠাকুমা – চার চারটে ইয়া বড় বড় মুখোশ পরা ডাকাত আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। শুধু আমসত্ব আচার আর নাড়ুর বাকি কয় কৌটো নাড়ু ভারী সিন্ধুকটায় ছিল বলে বেঁচে গেছে। (ইলার ইশারায় মধুই প্রস্থান।)

কর্তা – কী কী নিয়ে গেছে বদমাসগুলো?

ঠাকুমা — দু-দু কৌটো নিমপাতা পুর দেওয়া নাড়ু।

গিন্নি – শুধু নাড়ু? আর কিছু নেয়নি তো? আমার শাড়ী আর গয়নার ....

করতে – তোমায় মারে টারেনি তো?

ঠাকুমা – চাবি না দিলে গুলি করে দিত বুকে। খুব বেঁচে গেছি বাবা লোকনাথের কৃপায়। তবে বাবা লোকনাথের কৃপায় আমার লোকনাথ মরতে মরতে বেঁচে গেছেন।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা – দেখবে চল, দারুন তামাশা জমেছে ওপরে। ডাকাত সর্দারের অবস্থা গুরুতর। একসাথে গোটাকয়েক নাড়ু চেবাতে গিয়ে খুব বমি করছে বেচারা। আর পিঙ্কি শুধু কেঁদেই চলেছে।

কর্তা – বুঝেছি এখন। মধু, ধরে নিয়ে আয় সব কয়টাকে। দেখাচ্ছি মজা।

ঠাকুমা–কি মজা দেখাবি। কিচ্ছু করার এলেম নেই তোদের। তোদের হম্বিতম্বি শুধু মাঠে ময়দানে, টিভির ঝগড়াসভায়। শুধু নাটক, আর নাটক। এই নব্য ডাকাতদলকে ঠেকানো তোদের কম্ম নয়। নেতা গুন্ডাদের নকল করে ওরা বান্দরনাচ নাচছে তোদের, বাতেলা মারছে, মন্ত্রী নেতা ছোটলোকদের মুখের মত একই নোংরা ভাষা, একই বুলি একই কাজ। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোরা সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে ছোট থেকেই চোর ডাকাত করে তুলেছিস। তোরা আজ চোর ডাকাত সমাজবিরোধীদের গোলামে পরিণত হয়েছিস। তোদের নিজেদের ছেলেমেয়েরাই তোদের ঘৃণা করছে। তাদের এত অশ্রদ্ধা, এত অপমান সহ্য করছিস কি করে? নিজের নাতি নাতনি কিনা রেপ করার ভয় দেখাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাও আবার পুলিশের বড় কর্তার মাকে, মন্ত্রীর মামীকে,জজসাহেবের বোনকে! কবে তোদের চোখ ফুটবে? আজকের অনুষ্ঠিত ডাকাতির ঘটনাকে শিশুনাট্য বলে ভাবিস না। এই কুঁড়িগুলোকে যদি ফুটতে দিস, একদিন দেখবি তোরা কেউ রেহাই পাবি না ওদের হাত থেকে। আইনসভার সদস্যও নয়, মাননীয় নেতামন্ত্রীরাও নয়, এমন কি মহামান্য জজসাহেবরাও নয়। অসৎ রাজনৈতিক দল, ডাকাত দলের নেতারাও সব ধ্বংস হবে একজন আর একজনকে মেরে। সাধু সাবধান!

(এক হাতে বিল্টু, অন্য হাতে পিঙ্কিকে নিয়ে মধুর প্রবেশ। পেছনে ইলার হাত ধরে পল্টু)

পিঙ্কি – আমি আর ডাকাতি করবো না বাবা। ওই মেজদাই

বললো যে সিরিয়ালের কাল্লু যেমন মধুমতির ঠাকুমার গয়না ডাকাতি করার পর তাঁর কাছ থেকে পান কোকো কোলা চেয়ে খেয়েছিলো তেমনি ঠাকুমার নাড়ু ডাকাতি করে সিনেমার হিরো হয়ে যাবে। কিন্তু নাড়ুগুলো এত তেতো ছিল..............

বিল্টু – ভ্যা য়া য়া .... (ঠাকুমা নাতি নাতনিদের বুকে টেনে নিলেন)

এম পি, পুলিশ কমিশনার, মন্ত্রী, জজসাহেবদের একে একে প্রবেশ)

জজসাহেব – কি ব্যাপার দিদি ?

মন্ত্রী – কি ব্যাপার মামিমা, ভালো আছোতো ?

পুলিশ কমিশনার – কি কান্ড !

ঠাকুমা – আমার নাতি নাতনিরা আমায় তোদের ভবিষ্যৎ দেখালো। অনেক শিক্ষা পেলাম।

মধু – সবাইকে আগে নাড়ু খাওয়া।

(যবনিকা পতন)

মাইক – বারাসতের ডাকাতদের জামিন দিতে হবে – দিতে হবে– দিতে হবে, কামদুনি কাণ্ডের বিচার চাই–বিচার চাই, ধর্ষণকারীদের জেলে পোরা চলবে না, বিপক্ষ দলের বাড়ী জ্বালিয়ে দাও– জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, বিধর্মীদের দেবালয় গুড়িয়ে দাও – গুঁড়িয়ে দাও গুঁড়িয়ে দাও, পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে দিতে হবে, পুলিশের মাথায় বোমা মারো– বোমা মারো, জজের বিচার মানছিনা মানবোনা, আইন আদালত নিপাত যাক, নিপাত যাক, ডাকাত দল করে পুকার– বাংলা হবে চমৎকার, কলকাতা হবে লন্ডন, রাজ্য হবে লুণ্ঠন, বাজেয়াপ্ত করা চোরাই চাকরি খাওয়া চলবেনা – চলবেনা – চলবেনা, পার্থ অর্পিতা অনুব্রতের বাজেয়াপ্ত করা

সম্পত্তি বেচারাদের ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। ডাকাত চোরেদের জেলে রাখা বন্ধ কর, বন্ধ কর, ডাকাতরাজ করে পুকার - ইনক্লাব জিন্দাবাদ,ডারউইন গ্যালিলিও নিপাত যাক - নিপাত যাক, বিজ্ঞানকে নাকোচ কর - কুসংস্কারের শিক্ষা ধর, গণতন্ত্র পুড়িয়ে ফেল - রামরাজ্য চালু কর- চালু কর।

প্রথম প্রকাশ: পত্রপাঠ', অক্টোবর ২০১৪
ইটালিক্স অংশ নব সংযোজন

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

"আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"
–ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কবিতা সংকলন

একটি দুর্ঘটনা এবং

লিখেছেন - রাজু দত্ত

মৃত্যু শুধুই একটা সংখ্যা অশ্রু রক্তমাখা?
জীবন শুধুই ক্ষতিপূরণের কয়েক লক্ষ টাকা?
আমরা শুধুই ভোটের রোবোট?
রাষ্ট্রের পোষা যন্ত্র?
আমাদের লাশে গড়ছি আমরা,
সুমহান গণতন্ত্র!

কেঁদোনা বন্ধু, প্রশ্ন করো
এ লাশ বানালো কারা?
তোমার আমার করের টাকায়
পুষ্ট হচ্ছে যারা?

কার অবহেলা বেঘোরে কেড়েছে
এত মানুষের প্রাণ
কার প্রশ্রয় এত মানুষের
হাড়িকাঠে বলিদান?

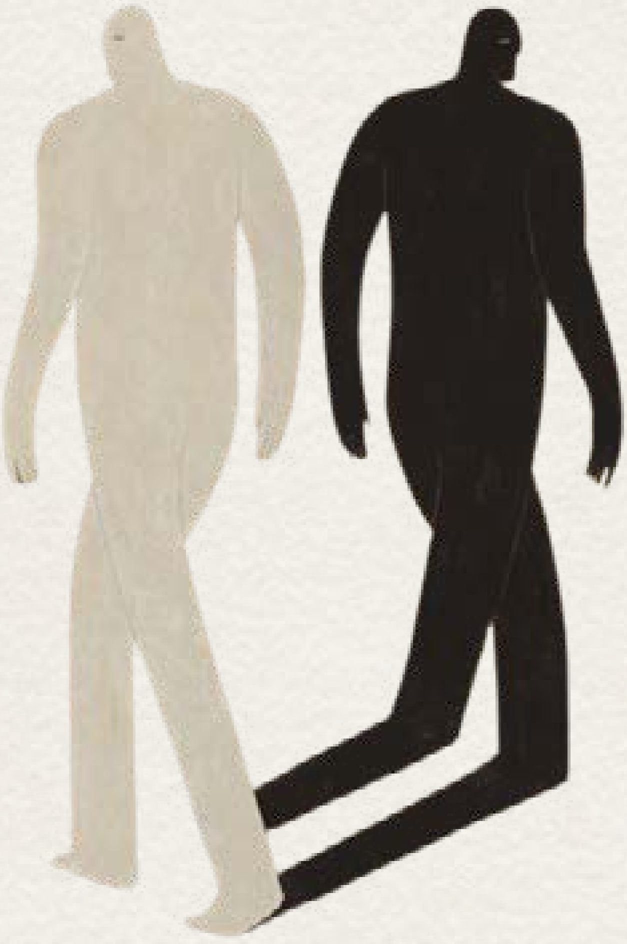
আমাদের দেশ নাকি ডিজিটাল!
এই তার হাল হায়!
কোন মুখে দেশনেতারা আজকে
প্রগতির গান গায়?

এ নয় প্রগতি, এ তো দুর্গতি,
আমাদের ক্ষতি এতে,
নেতাদের তাতে কি বা যায় আসে,

তারা চায় ভোট পেতে।

এই মৃত্যু দুর্ঘটনাই,
আমরা কি মেনে নেবো?
বন্ধু আজকে এ প্রশ্নটার
জবাব তুমিও ভেবো।

আমরা সবাই আজকে শামিল মৃত্যুর এ' মিছিলে,
কেউবা মরেছে কেউবা মরছে প্রতিদিন তিলে তিলে।



কবিতা



বৃষ্টি

লিখেছেন - তাপস কুমার সরকার

ও বৃষ্টি তুমি কোথায় আছো তুমি কি হারিয়ে গেলে?
সেই কবে তুমি এসেছিলে গিয়েছো কি সব ভুলে?

কি ভাবে যে তুমি ভুলে আছো পৃথিবীর সব ফেলে
প্রাণীকুল বড় অসহায় বলবো তোমায় পেলে!

জীবন কাটছে অতি কষ্টে উত্তাপে পৃথিবী জ্বলে
গাছপালা, পশুরা অতিষ্ঠ খুশি হবে তুমি এলে।

সব যন্ত্রণা ভুলে যাবো গো একবার কাছে পেলে
বলোনা তুমি আসবে কবে জীবনটা চলে গেলে?

তুমি একটু দেখোনা এসে প্রাণীকুল অসহায়
দেখো লু বইছে চারিদিকে সবাই যে নিরুপায়।

প্রখর রোদ্দুর লু বইছে গাছেরা দাঁড়িয়ে ঠাঁই
দেখো মৃত্তিকা ফেটে চৌচির একবিন্দু জল নাই।

গাছ গুলি সব মাথা নুয়ে পাতাগুলি ঝরে পড়ে
স্বচ্ছতা হারিয়ে বেচেঁ আছে ওরা জরাজীর্ণকারে।

মাঠের ফসল পুড়ে ছাই কৃষকের হাহাকার
ওদের কথা একটু ভাবো ওরা যেন নির্বিকার।

ও বৃষ্টি তুমি আসবে নাতো যে করছো এত ছল?
নদী নালার বুক ফেটেছে জেলেদের চোখে জল!

জল পিপাসু চাতক ডাকে ডানা মেলে উড়ে উড়ে
মেঘের কনা ভেসে এলেই বুক বাধে তাকে ঘিরে।

শান্ত পৃথিবীটা ক্ষিপ্ত আজ চারিদিক জল শূন্য
তুমি নদী নালা পূর্ণ করো সবাইকে করো ধন্য।



কবিতা



বিভেদের বিষ

লিখেছেন - প্রিন্সি বেরা

মাঠে খেলা একই সাথে, একই সাথে পাঠে
হঠাৎ কখন সময়সফর বিভেদের গণ্ডি দিল এঁকে।
সুধীন হাকিম, মহুয়া নার্স
অয়ন আবার সরকারি অফিসার
তবে ভোলা রাজনৈতিক অফিসের দাদা
কেউ প্রাইভেট কোম্পানির কেয়ার টেকার।

প্রাতিষ্ঠানিক মার্কশিটে নম্বর ভারী আমার
তবু অয়ন ব্যাটা চাকরি পেল, টেট স্ক্যাম চক্করে
দশলক্ষ নেই আমার, হেরে গেলাম বিভেদের টক্করে।

হে মহান সুপ্তশক্তি
এসেছে সময় ঘুরে দাঁড়াবার,
মানবতার ফণা তুলে দাঁড়াও সামনে,
দংশন করো বিবেকনাগিন!
বিভেদের বিষ জারিত হোক
সৃষ্টি হোক বিভেদহীন সম্রাজ্য।

কবিতা



আগমনী

লিখেছেন - তপন মাইতি

ভগবান আছে কিনা যুক্তি তর্কে যাব না
আস্তিক কিংবা নাস্তিক ধরে নিতে পারেন
গোঁড়া নয়,ধর্মের সাথে সাথে বিজ্ঞানকে ভালোবাসি
ধর্ম নিয়ে কত কিছু ঘটে গেল বহুযুগ ধরে
অথচ প্রশ্ন ওঠে ধার্মিক হতে পেরেছ?
আপনারটা ভালো ভালো আর সকলেরটা খারাপ খারাপ
এটা একদমই করবেন না অনুগ্রহ করে...
দখিন সমোষ্ণ হাওয়ায় ভেসে আসছে মহালয়া
আগমনের বার্তায় শারদীয়া তুমি
অকাল বোধনে একশো আটটা নীল পদ্মের কথা বলতে পারি
সাত্ত্বিক শারদীয়ার দশভুজা মহামায়া তুমি
তুমি নিশ্চয় শুধু মূর্তি নও তবে কীভাবে উষ্ণায়ণ মুখ বুঝে গায়ে মেখে যাচ্ছ দেবী?
বিশেষ আরাধনায় ব্রতী হচ্ছে রাজা সুরথ ও রাম
পুজো পুজো গন্ধের ভেতর শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
সংসারে সংসারে জেগে উঠছে এক্কেকটা দূর্গা
দেবীর কপালে চোখ আঁকছে শিল্পী আর জ্ঞানচক্ষু মেলছে ত্রিশূলে...

কবিতা

নারী তুমি কার?

লিখেছেন - রামকৃষ্ণ সাহা

তুমি তখন শৈশবে,
মুখে আধো আধো বুলি।
নদীর স্রোত তোমার ওষ্ঠে,
মন ফুলের মতো নিষ্পাপ।
তখন তুমি পিতার অধীন।
কৈশোরেও তার।
তুমি না নারী?
নেই স্বাধীনতা তোমার।

একসময় এসে দাঁড়ালে যৌবনে।
যৌবন; উচ্ছলতার বয়স।
বাঁধ ভেঙে ভাসাতে ইচ্ছা জাগে মনে!
না; অনেক পণ সহ পিতা করিলেন
পণ্যসম কন্যাদান।
তুমি এখন স্বামীর।
তুমি না নারী?
নেই স্বাধীনতা তোমার।

জীবন এগিয়ে চলে, যেন স্রোতহীন নদী।
তুমি তো শস্যক্ষেত্র!
তাই কর্ষিত হইল জমি-
যখন মালিকের মন চায়।
ফসল ফলালেন যত ইচ্ছে।
তাতে তোমার কি?

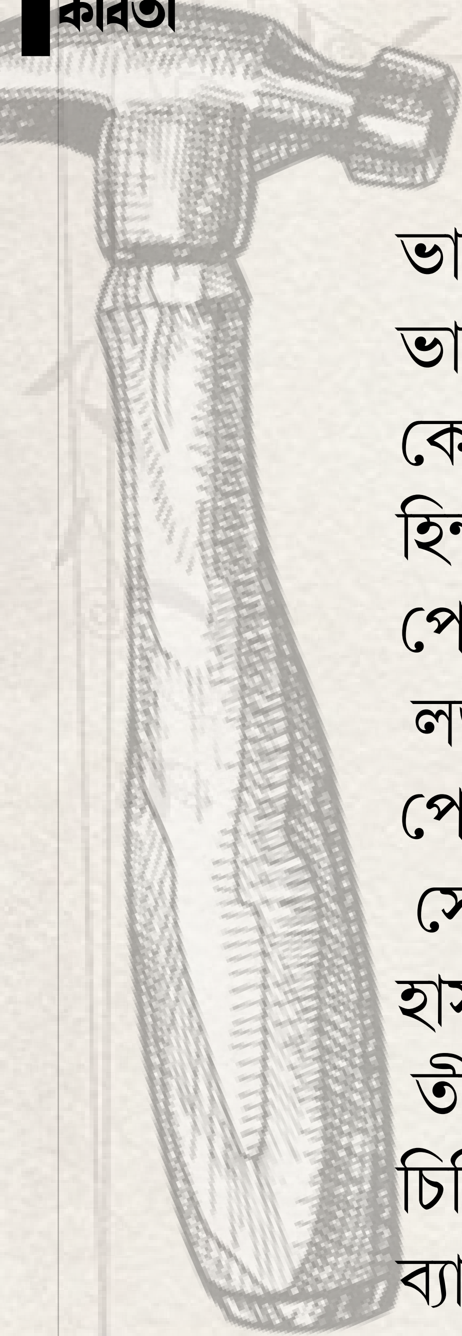
জমি তো তার।
পুত্র-কন্যা সহ দিন আসে দিন যায়
স্বামী দেবতা শেষ নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবার।
ও হে শাস্ত্রের নারী-
তুমি কি স্বাধীনতা পাবে এবার?

বয়সের ভারে আর অভিজ্ঞতায়,
সকলের সম্মুখে তুমি।
শিঁকে ছিড়িবে কি স্বাধীনতার?
তুমি না নারী?
নেই স্বাধীনতা তোমার।

পুত্র এখন যৌবনে,
এখন তুমি তার।
এ শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিধান?
তুমি না নারী!
ছিঃ! স্বাধীনতা চাইতে লজ্জা করে না তোমার?
পাপী, শয়তান তুমি।
নেই স্বাধীনতা তোমার।



কবিতা



শ্রম

লিখেছেন - রাজু দত্ত

ভাতটা যখন তুলছি মুখে,
ভাবছি কি যে ফলায় ধান,
কোন্ ধর্মের মানুষ তারা
হিন্দু নাকি মুসলমান?
পোশাক দিয়ে ঢাকছি যখন
লজ্জা আমার ভাবছি কি
পোশাকগুলো যে বানালো
সেই মজুরের ধর্ম কী?
হাসপাতালে ভর্তি যখন
তীব্র রোগের যন্ত্রনায়,
চিকিৎসকের ধর্মটা কী
ব্যাকুল কি সেই জিজ্ঞাসায়?
চলার সময়ে ভাবছি কি
আর রাস্তাটা কে বানিয়েছে?
মজুরগুলোর ধর্মটা কী
গুগল সেটা জানিয়েছে?
যখন কেউ চড়ছে গাড়ি,
বলতে পারো জানছে কে,
মাথার ঘাম ঝরিয়ে পায়
সেই গাড়িটা টানছে কে?
ধর্ম কী তার কেউ কি জানে
হিন্দু নাকি মুসলমান?
তবুও সবাই ঝগড়া করি,
কোনটা খাঁটি বেদ কোরান।
কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ সেটা
জানার আগে জানবে ভাই,
শ্রমেই গড়া এই দুনিয়া,
শ্রমের কোনো ধর্ম নাই।

কবিতা

একে অন্যের তরে

লিখেছেন - মনোরঞ্জন ঘোষাল

গাদা গাদা ফুল
কেন মিছি মিছি
ঢালি দেবতার পায়।
যদি ঐ ফুল
পদে নাহি ঢালি
কার কিবা আসে যায়।
শুন নৃপ বর
খুলি কর্ণ কুহর
অনেকের হাঁড়ি চড়ে।
একে অপরের
হাতে হাত ধরে
সংসার চরাচরে।



কবিতা

নাগরিক

লিখেছেন - সুদামকৃষ্ণ মন্ডল

---- ও চাষী কাঁদিস্ কেনে ?
---- পেটে নাই তো কিছু।
---- তা বলে চালে খড় কুথা ?
---- ভাগে পাই নাই।
----তুর বাচ্চা রুগ্ন কেনে ? জির জিরা হাড়ে ভরা ?
---- কচির মায়ের দুধ নাই।
---- লিখা পড়া করছু বটে ?
---- টেকা কুথা ? বই খাতা কিনবক কেমনে ?
---- তুদের পরব আসে ?
---- আসলি পরে মাইয়া মনকের ফুলে সাজাই।
---- যাবি কুথায় ইখন ?
---- কামিন খাটত।
---- তুদের একটা ডবকা ছুঁড়ি ছিল না, কাল হ - ?
---- হ। বিয়ার পিঁড়ি জুটেক নাই।
---- তাহলে ?
---- মাঠে যায় কামিন খাটত।
---- উড়া কথা কি শুনলি বটেক।
---- হ সত্যি বটেক।
---- কি কথাটাও।
---- মোনকের ঝি বাবুর বাড়ি ; -- ইজ্জত লিছে !
---- কালকও কুথা যাবি ?
---- ক্যানহ কও ? শুনছি বটেক।

---- দরবার যেতি হবে। বিরগেড ময়দান। মিছিল হবে। দাবি আদায় করিন লুব।

---- ভুট দুবো না।

---- ভুট নষ্ট করবি কেনে? দ্যাশের নাগরিক। বেঁইচ্যে আছিস ; দ্যাশে আছিস।



কবিতা

হাওয়াই চটির উত্থান ও পতন

লিখেছেন - অশোক কুমার দাস

(প্রতাপ মুখার্জীর ‘ জীবন যেরকম ‘ কবিতার অনুপ্রেরণায়)

২০১১ একটা হাওয়াইবাজী, আগুনের ছোঁয়া পেয়ে
সাঁই সাঁই করে উড়ে গেলো সেটা আকাশে, রকেটের মত
কি তার গতি! কি তার তেজ! কি তার দম্ভ! কত লম্বা লেজ!
আকাশের চাঁদটা এসে গেল তার হাতের মুঠোয়
মিটিমিটি হাসলো সে, নিচের মাটির দিকে তাকিয়ে,
আপন গরিমা দেখে হল সে মোহিত।
মুখে তার ফুটে ওঠে আস্ফালন, সে ছবির প্রতিচ্ছায়া
দেখা গেল আকাশে বাতাসে।
পেটে ভরা বারুদের তাপে, ফেটে গেল সেটা বজ্রশব্দ করে
আকাশের মাঝে, চারিদিকে আলোকের ফুলঝুরি
নানা রঙের, ঝরে ঝরে পড়তে থাকলো পৃথিবীর বুকে
সারা দিগন্ত জুড়ে।
জনগণ তাকিয়ে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে, রঙ্গমঞ্চ ভরে যায় সে দৃশ্যে
ভরে যায় রাস্তাঘাটে, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিঙে
ফুটে ওঠে তার গর্বমাখা হাসিমুখ।

২০২৩ ওঠা হলো শেষ -
বুকের আগুন গেল নিভে, এবার নাবার পালা।
বর্ণহীন, নিস্তাপ, বাক্যহারা ক্লান্ত বিদ্ধস্ত শরীর নিয়ে
নাবল সে মাথা নিচু করে - একা একা - অন্ধকারে
সাথীরা ছেড়েছে তারে, তার বারুদ হয়েছে শেষ
পাশে নেই কেউ।
তারপর

ধুপ করে মুখ থুবড়ে, পড়ে গেল সে
শূন্য প্রান্তরের মাঝে,
শুকনো ঘাসফুল আর আগাছার জঙ্গলে
মাথাটা তার ঢুকে গেল কাদামাটির মাঠে।
পেছনে ঢোকানো পাটকাঠির লেজটা শুধু ওপরে তখনো
কাঁপছে থর থর করে।
হারিয়ে গেল সে, নিরস নির্লিপ্ত পৃথিবীর মাটিতে
কেউ আর খুঁজলেনা তারে, মনে আর রাখলোনা কেউ।
ধাপার জঙ্গলের মাঝে শুয়ে
তার পুড়ে যাওয়া খোলসের কালো মুখ বলে ওঠে,
“ Thus I rise, thus I fall / Thus I enter / Thus I go”



কবিতা

ধর্মের ধারণ

লিখেছেন - বিপ্লব সেন

ধর্ম অবশ্যই ধারণ করে
সংকীর্ণতা করে না ধারণ,
মানুষকে ধারণ করে মানবতা
সেটাই ধর্ম রূপে বর্ণন।

সংকীর্ণতা আর ধর্ম কিন্তু
কখনোই নয় এক,
ধর্ম কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য
এটাই ধারণা সম্যক।

মানুষের ধর্ম মানব ধর্ম
সিংহের ধর্ম সিংহ এটাই অর্থবহ,
এটাই দেওয়া চেতনায় স্থান
"সময়োপচিত" অহরহ।

পদার্থের আবার মূল দুটি ধর্ম
ভৌত ও রাসায়নিক,
যদিও এটা আলোচনা নয়
এটা হেথায় অপ্রাসঙ্গিক।

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ খ্রিস্টান
ইসলাম হলো সংকীর্ণতা,
ধর্ম বলে চালানোর চেষ্টা
সেটা এক হীনমন্যতা।

এই হীনমন্যতা থেকে আসে
অন্ধবিশ্বাস অথবা কু সংস্কার,
মিথ্যা টিকিয়ে রাখতে এর
জুড়ি মেলা ভার।

এর থেকেই আসে মনে
ভীতির উদ্ভব,
সেই ভীতি হলো পুঁজি
ব্যবসার অনুভব।

ব্যবসার দিকে চোখ রেখে চলে
পুঁজিবাদে সব ই যে পণ্য,
সামন্ত তন্ত্রের এই ব্যবস্থা নিয়ে আসা তাই
ব্যবসা জমে অনন্য।

সংকীর্ণতা থেকে কুসংস্কার এর উদ্ভব
আর আছে অন্ধ বিশ্বাস আর ভয়,
সব কিছুর পিছনে কার্য কারণ
এর অন্যথা নয়!



কবিতা

চুল নড়াতে না পারলেও সে ঈশ্বর হয়ে যায়।

লিখেছেন - বিপ্লব সেন

পুজো যাগ যজ্ঞ করতেও
লাগে যে বিজ্ঞান,
অক্সিজেনের দহনে আগুন জ্বলে
এটা যে বিদ্যমান।

দেশলাই কাঠি লাগে করতে
অগ্নিসংযোগ,
ঘি লাগে সেটাও তো
বিজ্ঞানের ই প্রয়োগ।

মন্দিরের ভিতর আগুন জ্বলে
সেটাও বিজ্ঞানেরই দান,
সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়
সেই যজ্ঞের স্থান।

মসজিদের তৈরির ক্ষেত্রেও
সেই স্থাপত্য বিজ্ঞান,
ভিতরে প্রজ্বলিত আলো
সেখানেও নেই ভগবান।

গির্জার ঘণ্টা তৈরি হয়
সেই বিজ্ঞানের দানে,
স্থাপত্য বিদ্যা একই সেই

বিশেষ জ্ঞানে।

এর উপর লাগানো থাকে
বিদ্যুৎ নিরোধক,
সেটাও তো বিজ্ঞানের দান
এটা জ্ঞান সম্যক।

যন্ত্র চোখে নজরদারি
সেখানেও বিজ্ঞানের সহায়তা,
“তথাকথিত সর্বশক্তিমান”
সেখানেও নয় পরিত্রাতা।

ব্যবসা চলে “কল্পনা” ঘিরে
সেথায় অর্থ বিজ্ঞান নিয়ামক,
পুরুত সেবায়েত এর জামা কাপড়
বিজ্ঞান ই কে উদ্ভাবক।

দেবতার মূর্তি তৈরি হয়
শিল্পের বিজ্ঞান দিয়ে,
মন্দির মসজিদে এ জল আসে
বিজ্ঞানের কল বয়ে।

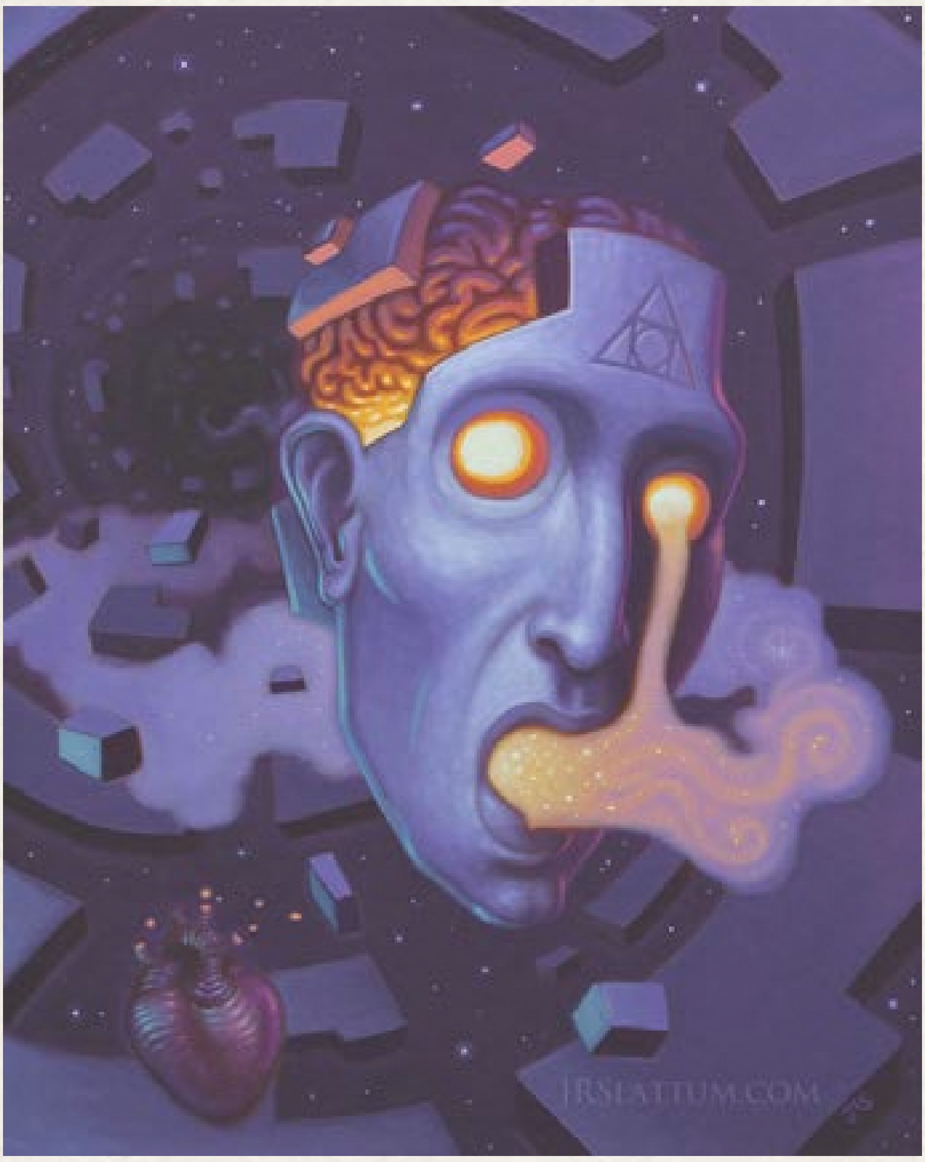
চাদর চড়ানো হয় সেই
বিজ্ঞানের যন্ত্রে বোনা,
বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত
উপাসনালয়ের প্রতি কোণা।

চুল নাড়ানো পরের কথা
এগুলো তো তার নিজের দস্তুর,
ধর্মের কল্পকাহিনী নয়
এসব সর্বশক্তিমান বিজ্ঞানের দানে ভরপুর।

কিছুই করতে পারবে না
চুল নাড়ানো দূরের কথা,
শুধুই মানুষের আঁধার কল্পনায়
তার আফিমের দেওয়া বার্তা।

অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে
লাগে ঈশ্বর চেতনা,
"চেতনার অন্বেষণে" আছে
আলোর পরিকল্পনা।

কার্য কারণ সম্পর্ক তে
রইলো পড়ে অবশেষ,
ব্যবসা ব্যবসা ব্যবসা করা
তাই দেওয়া "মিথ্যার সন্দেশ।"



কবিতা

ওদের কথা ভাবো

লিখেছেন - তাপসকুমার সরকার

ওদের অনাহারে দিন কাটে
রাস্তার ফুটপাতে
ওরা একটুও ভালো নেই
দিন কাটে রাস্তাতে!

পাশ কেটে যায় শত শত
বাবুদের দল
কেউ জানতে চায় না তোরা
কেমন আছিস বল?

ওরা যে বড্ড অসহায়
দু'বেলা পায় না খেতে
পেটের জ্বালায় ওরা
চারিদিকে হাত পাতে।

খোলা আকাশের নীচে
ওরা থাকে ফুটপাতে
কখন যে হবে সকাল
প্রহর গুনে রাতে।

ওরা সত্যিই দীন দুঃখী
ওরা ঘুমায় না রাতে
তবু কষ্ট নেইকো মনে
আনন্দে থাকে মেতে।

তোমরা তো ভালো আছো
একটু ওদের থেকে
তবুও হতাশ কেনো এত
অন্যের ভালো দেখে?

ডাল ভাত যাই হোক
দুবেলা তো জোটে?
বেশ তো ভালই আছো
আছো দুধে ভাতে।

ওদের আঘাত করো না
অন্ন তুলে দাও মুখে
ওদের কথা একটু ভাবো
তুমি থাকবে মহাসুখে।



কবিতা



প্রত্যাখ্যান

লিখেছেন - সজল কান্তি টিকাদার

স্বর্গের সুখ চাইনা বন্ধু,
চাইনা মুক্তি আমি-
এই বসুধারেই বেসেছি ভালো
দিয়েছি হৃদয় খানি।
এই পৃথিবীর প্রতিটি ধুলায়
কত যে আদর মাখা
এই ধরণীর মানবের মনে
প্রেমের আকুতি আঁকা।
শ্যামল বনানীর শাখায় শাখায়
ফোটে যে পুষ্প রাশি
প্রভাতের রবি পুবের আকাশে
হাসে যে লাজুক হাসি।

দিবসের শেষে সন্তান যবে
নাই আসে ফিরে ঘরে

মায়ের তখন ব্যাকুল হৃদয়
মন যে কেমন করে,
উৎকন্ঠা বুকে, দরজার পাশে
থাকে সে অপেক্ষায়-
বলোতো বন্ধু এমন ছবি -
স্বর্গে কি পাওয়া যায়?

সবুজ ঘাসের নরম ডগায়
শিশির যখন জ্বলে-
কে চায় তখন স্বর্গের সুধা
ফিরায়ে দিলেও চলে।
বসন্ত আনে নব কিশলয়
হাসে যে পলাশ ফুল
গুন গুন গুন গীত গেয়ে যায়
ফুলে ফুলে অলিকুল।
শাওনের কালে জলভরা মেঘ
ঢালে যে বরিষধারা
কত যে হরষ জেগে ওঠে হৃদে
হই যে আত্মহারা!
আনন্দ দুঃখে গড়া ধরাতল
স্বর্গের চেয়েও দামী
তাইতো বন্ধু চাইনা স্বর্গ--
চাই না মুক্তি আমি।

আবার

লিখেছেন - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, বেশ সেজেগুজে এসেছে
কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে না
আজ তার নীলষষ্ঠী
যৌবন বয়েসে এই নিয়ে কত না চটুল রঙ্গ করতাম
এখন শুধু একটা পাতলা হাসি
অন্যের বিশ্বাসে নাকি আঘাত দিতে নেই
আর এক বন্ধু, যে প্রথম আমায় ছাত্র রাজনীতিতে টেনেছিল
তার আঙুলে দেখি একটা নতুন পাথর-বসানো আংটি
আমার কুঞ্চিত ভুরু দেখে সে
দুর্বল গলায় বলল
শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,
তাই শাশুড়ি এটা পরতে বললেন, মুনস্টোন,
না বলা যায় না।
আমার মনে হল, এ যেন আমারই নিজস্ব পরাজয়!
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বাড়ি, মাঝে মাঝে তাঁর আলাপচারি শুনতে
এখনও কত কিছু শেখার আছে
আজই প্রথম দেখলাম, তাঁর দরজায় পেছনে দিকে
গণেশের মূর্তি আটকানো
প্রশ্ন করিনি, তিনি নিজেই জানালেন,
দক্ষিণ ভারত থেকে ছেলে এনেছে, কী দারুণ কাজ না?
সুন্দর মূর্তির স্থান শো-কেসের বদলে দরজার ওপরে কেন
বলিনি সে কথা, সেই ফক্কুড়ির বয়েস আর নেই
বয়েস হয়েছে তাই হেরে যাচ্ছি, অনবরত হেরে যাচ্ছি...

অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই
চতুর্দিকে এত বিশ্বাস, দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে কত রকম বিশ্বাস!
যে গেরুয়াবাদী ঠিক করেছে, পরধর্মের শিশুর রক্ত
গড়াবে মাটিতে, চাটবে কুকুরে
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
ধর্মের যে ধ্বজাধারী মনে করে, মেয়েরা গান গাইলে গলার নলি
কেটে দেওয়া হবে
টেনিস খেলতে চাইলেও পরতে হবে বোরখা
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
যে পেটে বোমা বেঁধে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে
যে পেশি ফুলিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে
পদানত করতে চাইছে গোটা বিশ্বকে
এরা সবাইতো বিশ্বাসীর দল!
সবাই বিশ্বাসী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসী ...
এক-একবার ভাঙা গলায় বলতে ইচ্ছে করে
অবিশ্বাসীর দল জাগো
দুনিয়ার সর্বহারা অবিশ্বাসীরা এক হও!

প্রবন্ধ - নিবন্ধ

বিদ্যাসাগরঃ চরিত্রের বিশিষ্টতা

লিখেছেন - শ্রীশরৎ কুমার রায়



বিদ্যাসাগর (যৌবনে)

(এই লেখাটি লেখকের ১৩৪১ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যচরিত্রের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন–

এ জগতে সোজাপথে চলা কি সহজ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজাপথে চলা যায়? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজাপথে চলিতে পারিত? সেইরূপ এই সকল তেজস্বী পুরুষসিংহ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি? আমি এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন আট বৎসরের বালক তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে তিনি আমাকে ভালবাসিতেন এবং

সেই দিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি, কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না; বলি, হায়! হায়! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিষ যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানবজীবনের মহত্ত্বজ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি, আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহা অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া না দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি সেই পুরুষসিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে সমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশিরাঃ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই, উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই, উছলিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখ- কাতর হৃদয় ছিল; সেই জন্যই অপরের প্রতি

অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে মনুষ্যত্বের প্রাপ্য কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধও সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানবজীবনের পক্ষে এত হীন মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত।

অনেকে জানেন, তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি? এই অদম্য, অনমনীয় মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; ডিরেক্টর শুনিলেন না, বলিলেন, “You must! You must!” এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এ চাকুরী তাঁহার বিষ বোধ হইতে লাগিল; কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না।

না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না।

বর্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি, মানব-প্রকৃতির এই গভীর ‘রহস্যত্রয় মানবজাতির মুখপাত্র- স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে ভবিষ্যতের যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত যে, বর্তমানের কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না, তখনও এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশালী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার

অন্তরে বাস করিতেছিল। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়- গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনায় অস্থির করিয়া তুলিত।

এমন কি, তিনি ক্ষোভে, দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন। একদিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার পরিচিত কয়েকজন বন্ধু বসিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—

> **"এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহ'লে একবার দেখি! এ জগতের মালিক থাকিলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?"**

এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোক ঐ বিধবাটির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দর দর ধারে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ফল কথা এই যে, তিনি যত সত্ত্বর স্বদেশবাসীকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত সত্ত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন।

বর্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের কি ছবি ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। ভবিষ্যৎ ভারতসমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটার সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই; কিন্তু স্থূলতঃ তাহার

মূল ভাবটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্তমান ভারতের যুগ- প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে; আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্য জ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ই তাহার প্রমাণ । হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসী- দেশের প্রসিদ্ধ কোমৎ-দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় বন্ধুদিগকে বলিলেন, “বাবারে, একটা মহাজন্তু ! দেখলে কেমন বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ! মানুষটার যেমন হৃদয় তেমনি মাথা !” একথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগ সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যাহা কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়া- ছিলেন তাহা প্রাচ্য ভাবে ও প্রাচ্য জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন । প্রাচ্য প্রীতি ও ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন এই প্রাচ্যপ্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয় নব-সাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশ মানবচরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয় নব চরিত্র ও নব সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। কার্য্য এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে শুনিতেছি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগ মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা

স্বদেশবাসী- দিগকে দিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেন্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য, করিতে হইয়াছিল! না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক। নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; কয়েকস্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বীটন অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে ডিরেক্টরের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়, সেই মতভেদ হইতেই মনোমালিন্য জন্মে। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উঠিবে না। অতএব বলিতেছি, তিনি বর্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক তাঁহারা অতীতের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত যে, বর্তমানের প্রতি যখনি তাহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তাঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে চান। তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায়; অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অপর শ্রেণী সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছেন; ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা

বাস করেন, আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইদানীংকালে রামমোহন রায় এই প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মানবমনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে; কারণ, আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই। যে মানুষকে আশা দেয়, সে-ই জীবন দেয়। যিনি বলেন, তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না, তোমাদের জন্য শুভদিন আসিয়াছে, চল, তদভি- মুখে অগ্রসর হই; তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর তলে দাঁড়াইতে ভালবাসি। এ জীবন যেন রণক্ষেত্রের ন্যায়, আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছি; নিরন্তরই আশানিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি; বিষাদ ও অনুশোচনার যাতনা সহিতেছি; অতি বলবান্ হৃদয়ও এই কঠোর সংগ্রামের সময়ে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়ে। যখন আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভারবহনে ম্লান ও ম্রিয়মাণ হই, তখন যদি কোনও বলবান্ পুরুষের আশ্বাসজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যদি শুনিতে পাই, একজন বলিতেছেন, অগ্রসর হও। অগ্রসর হও। ভয় নাই; জয়শ্রী সম্মুখে; তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়; আমরা স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানবসমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরম লাভ; একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি। ইঁহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়া ও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইঁহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইঁহাদের চরিত্র-সম্পত্তি পাইয়া

আমরা ধনী হই। ইঁহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থিমজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাঁটি জিনিষও নষ্ট হয় না। যাঁহারা মননের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে জীবিত, তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতীয় গৌরব। যেমন হিমালয়ের পাদশৈলসকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি অপর জাতিসকল।

দূর হইতে এই সকল আসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইঁহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপানস্বরূপ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

> **“বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতি বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।”**

“যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদন তাঁহাদের সেই প্রবলশক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ এই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্ব-প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক;

অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে যুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচার ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন। স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না। স্বজাতিকে

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষণা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে যুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। যুরোপীয়দের তুচ্ছ বাজা অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের যুরোপীয়-স্থলভ গভীর আত্মসম্মানবোধে পরিচয় পাওয়া যায়।”

“আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংশ্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে দয়া নহে, বিদ্যা নহে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।”

প্রবন্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লিখেছেন - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা ‘মরা’ ‘মরা’ বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনোরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণ সেন ঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশীর লড়াই-এর কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালী-চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে,

বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্ সংযত, কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মতো বাসর্বস্ব সাধারণ বাঙালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব জ্ঞাপন করিতে গেলে বোধহয় আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজির আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়তো অসম্ভব; তথাপি ঐ সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে-বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা।

অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।

আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আন্দোলন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ

বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অভাব। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগরযে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না। এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনন্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধ মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্রজীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই

ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমবেশে আরও দুর্গম; কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সমগ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল। আর নতুন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিরাট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন বা ইংরাজের সংস্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার

পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই।

তিনি ঠিক যেমন বাঙালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণদ্বারা পরত্বগ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকেই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না।

কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর

পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অথচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দের মধ্যে শতকরা নব্বুইটি কার্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটি নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতগ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল, কোনো বালিকা-বিধবার মলিন মুখ দর্শনামাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত

কর্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য তিনি রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এসময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিত্রলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট কথা বলেন না। ... বস্তুতই

দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময় সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বোধকরি সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্য-পথে চালাইত, তিনি সেইপথে চলিতেন।

মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।

বিদ্যসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথাটা না তুলিলে চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা-বিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি

ব্যথিত রাখিত, দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত, তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে? বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহার রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটিভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনো-না-কোনো প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন-সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নতুন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু

ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

চেতনার অন্বেষণে পত্রিকা

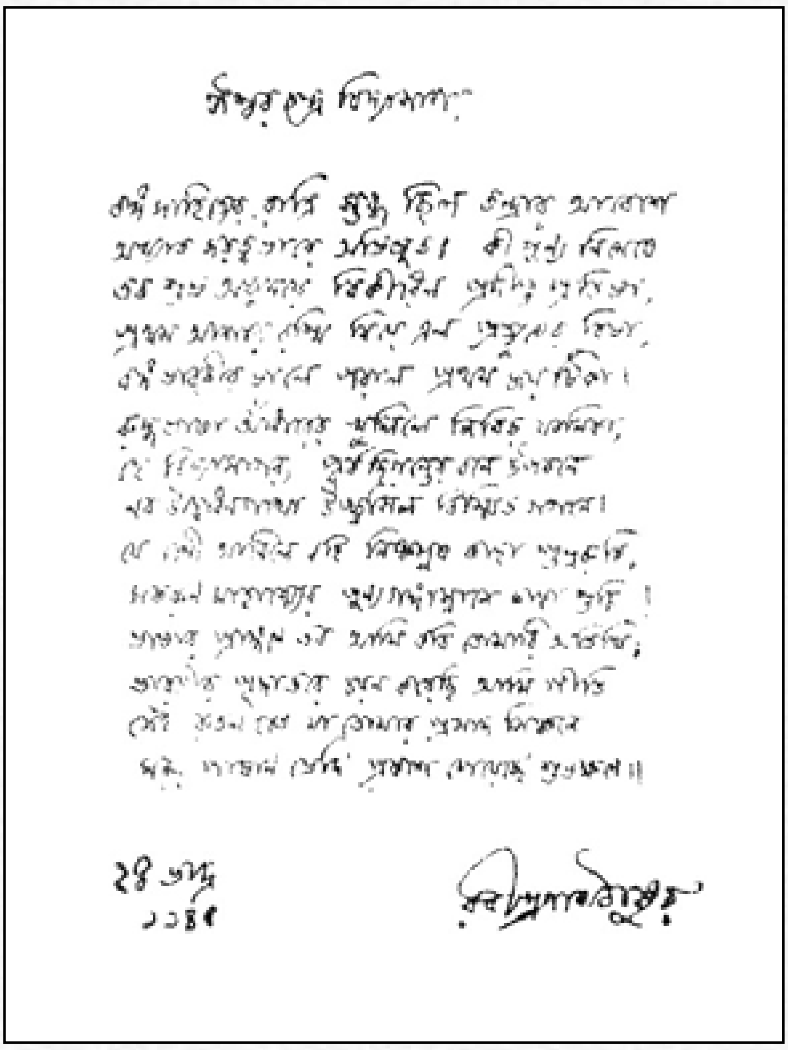
"শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে,এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কু-সংস্কারের কবল হইতে মুক্তি -শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার সংকল্প।"

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রবন্ধ

বিদ্যাসাগর চরিত

লিখেছেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ— করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে— করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন

তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীতি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়— যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র

জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার নিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলাগদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো— তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক

সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোকে, তাহা সর্বব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না; তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। —অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ

করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক— অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন —অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের

অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়— আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত— কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনো অংশে কাহারো নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণবিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো

কারণে, তিনি কখনো পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।১

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারো

অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্রও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে।[২]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

তর্কভুষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন, কি ছোটো, কি বড়ো, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি wষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারো ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনো কোনো বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্ ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।১

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন-কি, দুই-চারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

ভালুক নখর প্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত

করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপরযুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।

অবশেষে শোণিতশ্রুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন। আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভ সংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, ‘একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।’ শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, ‘ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।’ বলিয়া সুতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নত চরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বাধে হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতাে আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনাে সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোকে ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষেণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহেন তর্কালংকারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কলংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[২]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বড়বাজার হইতে ঠঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁর চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিয়া ঐ স্ত্রীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপঠাকুর, আজ বুঝি তামোর খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোকে ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপঠাকুর, জল খাইয়া না, একটু অপেক্ষা করো এই বলিয়া নিকটবর্তী গায়োলার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরো মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন। পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তামোর এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাঁহার আহলাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গাঘোটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতীদেবী এক অসামান্য রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগরগ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে,

সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না— চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতীদেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়— এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতীদেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম পল্লী প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অনুদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, 'যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?'[২]

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাইশলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতীদেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা -সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত

না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয়-সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?’ ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, ‘গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।’ এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা! তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতীদেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

জননীদেবী সাহেবের ভোজন-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতিবৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোকে সাহেবের ভোজন-সময়ে চিয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব হিন্দুর মতো জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের

কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলাকে, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ-সকল বিবাহিত লাকেকে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ-সকল স্ত্রীলাকেকে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণে জননীদেবী ঐ-সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলাকেের সহিত একত্র এক পাত্রে ভাজেন করিতেন।[২]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গাপেনে আয়াজেন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া ক যুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটুক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন। আর, এই রমণীকে কোনাে শাস্ত্রের কোনাে শ্লোক খুঁজিতেই হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালাচেক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলাচেনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে

জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে— এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর, আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাঁহার চরিত-কীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না।

সঙ্গে করিয়া ট্যাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।[২]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে-প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো অবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরিবাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড— স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'যশুরে কৈ',

ও তাহার অপভ্রংশে ‘কসুরে জৈ’ বলিয়া খেপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।২

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদিকার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া বন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারি জন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত -করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে গামছা পরিধান

করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।২

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ায় সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃতকলেজের অ্যাসিস্টান্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি -ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য- কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল কার্-

সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার সাহেব কার্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে, বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চলিবে কী করিয়া।' তিনি বলিলেন, 'আলু পটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।' তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতি মাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক্‌ -নামক একজন ইংরেজকে কয়েক মাস বাংলা ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট-সাহেব আমার বন্ধু— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।”[২] মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও

কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পাবিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ-সমস্ত সদগুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্ত্রীজাতির স্নেহ দয়া সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে।

যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি, অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্তদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার কবিযা দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি -মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি -বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে

বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন—এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অতকৃজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত

বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারকনাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বললেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।২ পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ মহকুমায় ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্‌ ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্‌, অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার

গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্টেনেণ্ট গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্টেনেণ্ট গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুইমাস-কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।২

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম-লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুকুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই ‘আহা উহ’ এবং

অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নি:শঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত-শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

অন্নছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি হাড়ি ড়োম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন। এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না

হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ-পূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধায় মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করি—

বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বললেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস

পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুবোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য-কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনো জলস্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, জীবনের মধ্যপথে স্বচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়া ছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে— তেমনি

এই ব্রাহ্মণতনয় জন্ম-দারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন— ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন, ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যর দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্য-সাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য

লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক-কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার ‘বিধবাবিবাহ’গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।—

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও প্রাণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দুষিত হইলে তাহার পোষকতা করতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু, কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণ! হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক, পদে পদে তাহার

উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভারিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় ফলভোগ করিতেছ!

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্মের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা -প্রয়োগ-পূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব -দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর

দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা 'জননীদেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।'[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্টেনাণ্ট গবর্নর হ্যালিডে-সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে

আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোট ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ

পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহবল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদুর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া— সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া— সরল সবল অটল মাহাত্মের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং— যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল

হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

ভাদ্র ১৩০২

১। স্বরচিত বিদ্যাসাগর চরিত

২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন -প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত

সত্য ও অসত্য

–আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

"প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া আমি অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি এবং সেই উপলক্ষে কত হাজার হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ রাহুনামক কোনো রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সংঘটিত হয় না, এবং শেষে মর্ত্যবাসীদের কাঁসর, ঘন্টা, ঝাঁঝর এবং খোল-করতালের সহযোগে পূজা-অর্চনায় রাক্ষসাধিপতি রাহু তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া চন্দ্র-সূর্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহার মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে জনশ্রুতি – ইহা নিছক মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত।

পৃথিবী, চন্দ্র, এবং সূর্য আপন কক্ষপথে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর অথবা চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িলেই চন্দ্র অথবা সূর্যের অংশবিশেষ ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং তাহাই গ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইহার মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহ্বর হইতে চন্দ্রসূর্যের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা ঝুটা।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক

সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া আসিলাম। তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল, কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্খঘন্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল-করতালের সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়রা রাস্তায় মিছিল বাহির করে, অমনি সেই সকল সত্যের পূজারীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া দলে দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচান্তের মতো হাঁড়িকুড়ি ফেলার ধুম লাগিয়া যায়।

আমি অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকের কথা বলিতেছি না, কারণ যুক্তির দ্বারা সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইবার মতো শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। কিন্তু যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কী তাহা জানে, অথচ জীবনে তারা বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, যে মনের গোপনে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরে জনসমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই- সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।।”

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির যুক্তিবাদী ম্যাগাজিন

চেতনার অন্বেষণে

“আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে; এবং কাহারও পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে; টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন; আমরা সেখানে স্থান পাইব না।”
-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখা পাঠানোর উপায় ও নিয়ম

কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখবেন:

- বিষয়: বিষয়-মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।
- লেখার ধরন: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি।
- শব্দ সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই।
- লেখার শর্ত: লেখায় কোনপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। কুসংস্কার ছড়ায় এমন কিছু থাকলে লেখা বাতিল হয়ে যায়।
- সময়সীমা: প্রতিমাসের ২৫ তারিখের আগে পাঠান। ২৫ তারিখের পর পাঠালে পরের মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- লেখা পাঠানোর ইমেইল:
  yukbadira@gmail.com
  হোয়াটসঅ্যাপ: +91-94337-94113

লেখা পাঠান

গ্রাহক হোন

(বিনিময় মূল্য নাই)
মেসেজ করুন
হোয়াটসঅ্যাপে

Whatsapp
+91-9433 794 113

পত্রিকার প্রতিমাসে ইমেইলে পেতে গুগল ফর্ম পূরণ করুন
ফর্ম লিংক

টেলিগ্রামে চ্যানলে যুক্ত থাকতে পারেন
@Yktibadira

QR for Subscription



‘চেতনার অন্বেষণে’ যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তিবাদী পত্রিকা
Email: yuktibadira@gmail.com, WhatsApp: +91-94337-94113
Editor-in-chief: Prasenjit Konar, Kolkata - 700056